অতীত ও ঐতিহ্য

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ পর্যায়ভুক্ত সপ্তমশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯– এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্রও প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী অতীত এবং ঐতিহ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা সারণির ব্যবহারও করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, প্যঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম 'অতীত ও ঐতিহ্য'। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের বইটি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক কয়েকটি ধারণাকেও একটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পচ্ছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ম্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী-- 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো। সেগুলির মাধ্যমে হাতেকলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৭
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

উত্তরা চক্রবর্তী
সৈয়দ আবিদ আলী
প্রবাল বাগচী
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
তিস্তা দাস
সোমদত্তা চক্রবর্তী
কাশ্‌শফ গনি
অনির্বাণ মণ্ডল
প্রত্যয় নাথ
পরমা মাইতি

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল

অনুপম দত্ত

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইতিহাসের ধারণা	১
২.	ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	৭
৩.	ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	২৫
৪.	দিল্লি সুলতানি : তুর্কো-আফগান শাসন	৪৩
৫.	মুঘল সাম্রাজ্য	৬৯
৬.	নগর, বণিক ও বাণিজ্য	৯৯
৭.	জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি : সুলতানি ও মুঘল যুগ	১১৩
৮.	মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	১৫৯
৯.	আজকের ভারত : সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন	১৬৭
	শিখন পরামর্শ	১৭৩

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের ধারণা

১.১ ইতিহাসের গল্প-সল্প

যত পুরোনো দিনের কথাই হোক, গল্পের মতো করে বললে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু মুশকিল হলো অনেক ইতিহাস বইতেই গল্পগুলি ভালো জমে না। খালি রাজা-উজিরের নাম-ধাম, যুদ্ধের সাল-তারিখ। তাই ইতিহাস পড়তে গিয়ে গল্পের মতো সেই মজাটা সবাই পায় না। গুলিয়ে যায় নামগুলি। মনে থাকে না সাল-তারিখ। কে কার পরে ক্ষমতায় এলেন—সেসব মনে রাখা খুবই কঠিন!

কিন্তু কঠিন হলেও একটু আধটু নাম বা সাল মনে রাখা জরুরি। কারণ, যে সব ঘটনার কথা ইতিহাস বইতে থাকে, সেগুলি আজ থেকে অনেক-অনেক বছর আগে ঘটেছিল। আবার সব ঘটনাগুলি একই দিনে বা একই বছরে ঘটেনি। তাহলে কীভাবে জানা যাবে কোন ঘটনাটা কবে ঘটেছিল? তাই আগে-পরে করেই সাজাতে হয় ইতিহাসকে। তার জন্য জানতে হবে ঘটনাগুলির সময়কাল। ইতিহাসে সময় মাপতে গেলে চাই তারিখ, মাস, সাল, শতাব্দী, সহস্রাব্দ—এইসব নানা সময় মাপার হিসাব। সেখানে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার হিসাব বিশেষ কাজেই লাগে না! তাই সাল-তারিখগুলি যতই জটিল হোক, আসলে ওরা নির্দোষ। পাছে আমরা সময়ের হিসাবে গোলমাল করে ফেলি, তাইতো ওরা আমাদের সাবধান করে দেয়। ফলে ইতিহাস বইতে একটু-আধটু সাল-তারিখ থাকবেই। নানান ধাঁধা বা মজার হিসাব করে সাল-তারিখ মনে রাখাটা একটা খেলা। দেখোতো, কত ভালো করে তোমরা এই খেলাটা খেলতে পারো বছর জুড়ে।

জটিল নাম-ধামগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা তবু থেকেই গেলো। কারো যদি নামের আগে 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' বা 'সকলোত্তরপথনাথ'-এর মতো উপাধি বসে! কারো যদি নাম হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি! এসব নাম বা উপাধি মনে রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু এই উপাধি বা নামগুলি অনেক কাল আগের মানুষদের। তাঁরাও হয়তো এতো বড়ো বড়ো নাম-উপাধি নিয়ে গোলমালে পড়তেন। কিন্তু উপায় ছিল না। ঐ সময় এমন বড়ো খটোমটো উপাধি এবং নামেরই চলন ছিল। সেই নামগুলি এখন আর বদলে নেওয়ার উপায় নেই। বাবর, আকবর প্রভৃতি নামগুলি বেশ ছোটো, সহজেই মনে থাকে।

"বাবার হইল আবার জ্বর
সারিল ঔষধে"— এই বাক্যটায় ছ-জন মুঘল সম্রাটের নামের হদিশ লুকিয়ে আছে। দেখোতো নামগুলি খুঁজে পাও কিনা? সূত্র লুকিয়ে আছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

কিন্তু যতোই শক্ত লাগুক, দন্তিদুর্গ নামের কাউকে-তো আর ছোটো করে দন্তি বা দুর্গ বলে লেখা যায় না!

কিন্তু ধরা যাক তোমাদের কারো কারো বেশ মনে থাকে সব নাম বা সাল। ইতিহাস বুঝতে পারা কি তাকেই বলে? সোজা কথায় এর উত্তর হলো— না। সাল-তারিখ নাম-ধাম মুখস্থ থাকলেই ইতিহাস জানা হয় না। তাহলে ইতিহাস জানা কাকে বলে? ছোটো করে বললে বলা যায়, বছরের পর বছর ঘটা নানান ঘটনার এবং অনেক লোকের অনেক কাজকর্মের কারণ এবং ফলাফল বোঝার চেষ্টা করাই ইতিহাস জানা। এমন অনেক ঘটনা এবং কাজ আগে ঘটেছে, যার ছাপ আজও আমাদের চারপাশে রয়েছে। তাই সেই সব কাজ এবং ঘটনাগুলো বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। সেই ধারণা তৈরির জন্যই ইতিহাস পড়ার দরকার হয়।

টুকরো কথা

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাসের সব উপাদান একরকম নয়। একটি পুরোনো মূর্তি, পুরোনো মুদ্রা বা পুরোনো বই এক জিনিস নয়। তাই ইতিহাসের উপাদানগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন--- লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও লিখিত উপাদান। পাথর বা ধাতুর পাতে লেখা থেকে পুরোনো দিনের অনেক কথা জানা যায়। সেগুলিকে বলে লেখ। তামার পাতে লেখা হলে তা হয় তাম্রলেখ। আবার পাথরের উপর লেখা হলে তা হয় শিলালেখ। আর কাগজে লেখাগুলিকে বলা হয় লিখিত উপাদান।

১.২ ইতিহাস জানার রকমফের

পুরোনো দিনের যেসব জিনিস আজও রয়ে গেছে সেগুলোই অতীতের কথা জানতে সাহায্য করে। পুরোনো ঘর-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ, মূর্তি, টাকা-পয়সা, আঁকা ছবি, বইপত্র থেকে এক একটা সময়ের মানুষের বিষয়ে আমরা জানতে পারি। তাই সেগুলি ইতিহাসের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতির কোপে আর মানুষের হাতে পড়ে সেসব উপাদানের অনেক কিছুই আজ আর নেই। তাই একটানা ইতিহাস জানার উপায়ও নেই। ভাঙাচোরা, ছিঁড়ে যাওয়া উপাদানের টুকরো খুঁজে জুড়ে নেন ঐতিহাসিক। তারপর সেগুলিকে সাজিয়ে নেন আগে পরে করে। তার থেকে তৈরি করেন অনেক আগের সেই সময়ের একটা ছবি। আর যেখানে উপাদানের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

টুকরো উপাদান দিয়ে ইতিহাসের ফাঁক ভরাট করার সময় ঐতিহাসিককে সাবধান থাকতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় যাতে ঠিক টুকরো ঠিক সময়ে খাপ খায়। সময় আর জায়গা আলাদা হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায় কথার মানে। সেটা ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হয়। আজকাল তোমরা 'বিদেশি' বলতে ভারতের বাইরে অন্য দেশের লোকেদের বোঝো। কিন্তু সুলতানি বা মুঘল যুগে 'বিদেশি' বলতে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে কোনো লোককেই বোঝাতো। তাই শহর থেকে অচেনা কেউ গ্রামে গেলে তাকেও ঐ গ্রামবাসীরা 'পরদেশি' বা 'অজনবি' ভাবতেন। ফলে মুঘল যুগের কোনো লেখায় 'পরদেশি' কথাটা দিয়ে সবসময় ভারতের বাইরে থেকে আসা লোক বোঝাতো না, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আবার ধরো, 'দেশ' বলতে অনেকেই

তাঁদের আদি বাড়ি বোঝেন। যেমন, কেউ হয়তো বলেন— তাঁর দেশ বর্ধমান। এখানে 'দেশ' আসলে একই রাজ্যের মধ্যে আলাদা অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে। কারণ বর্ধমান জায়গাটি ভারত বা পাকিস্তানের মতো দেশ নয়। সেটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা মাত্র। তাহলে দেখো সুলতানি বা মুঘল আমলে কিংবা আজকের দিনেও 'দেশ' কথাটার কতো রকম ব্যবহার হয়। যখনই ইতিহাস পড়বে তখন আগে বুঝে নেবে কোন সময়ে কোন অঞ্চলের কথা সেখানে বলা হচ্ছে।

এই বইতে প্রায় হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস তোমরা জানবে। মোটামুটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে সপ্তদশ শতক পেরিয়ে অষ্টাদশ শতকের দোরগোড়া পর্যন্ত এই হাজার বছরে ভারতবর্ষে অনেক কিছু বদল ঘটেছে। আবার কিছু কিছু বিষয়ে মিল রয়ে গেছে। তবে কোনো বদলই রাতারাতি ঘটেনি। এখানে সেই ধারাবাহিক বদলগুলির নানা কথাই বলা হয়েছে।

টুকরো কথা

হিন্দ, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া

*খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অবশ্য এদেশে আসেননি। তিনি পারসিক লেখাপত্র থেকে ভারত সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ এলাকা কিছুদিনের জন্য পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন এই অঞ্চলের নাম হয় 'হিদুষ'। ইরানি ভাষায় 'স'-এর উচ্চারণ নেই। তাই 'স' বদলে গিয়ে হয়েছিল 'হ'। ফলে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলগুলি হিদুষ নামে পরিচিত হলো। আবার গ্রিক ভাষায় 'হ' এর উচ্চারণ নেই। তার বিকল্প 'ই'। অতএব যা ছিল সিন্ধু-হিদুষ, তা গ্রিক বিবরণে অনেকটা বদলে গিয়ে 'ইন্ডিয়া' হলো। তবে খেয়াল রেখো, সেইসময় ইন্ডিয়া শব্দটি সিন্ধু ব-দ্বীপ এলাকাকেই মূলত বোঝাত। পরবর্তী সময়ে গ্রিকদের বিবরণী পড়লে বোঝা যায় পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া বলতে উপমহাদেশকেই বোঝানো হয়েছে। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র —এই প্রধান দুই সীমানা সম্পর্কে গ্রিক লেখকরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিদেশি তথ্যসূত্রে আরেকটি নাম পাওয়া যায়— 'হিন্দুস্তান'। আরবি-ফারসি ভাষায় হিন্দুস্তানের কথা বারবার এসেছে। ২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানীয় শাসকের একটি শিলালেখতে হিন্দুস্তান শব্দটি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও সিন্ধু নদী সংলগ্ন অঞ্চলকেই হিন্দুস্তান হিসাবে বোঝানো হয়েছে। দশম শতকের শেষভাগে অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত **হুদুদ অল্ আলম** গ্রন্থে 'হিন্দুস্তান' শব্দ দ্বারা সমগ্র ভারতকে বোঝানো হয়েছে।*

১.৩ ইতিহাসের গুণ-ভাগ

একটি দিনকে আমরা ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করতে পারি। কিন্তু হাজার হাজার বছরকে ভাগ করার উপায় কী? ঐতিহাসিকরা তাই 'যুগ' দিয়ে আলাদা করেন লম্বা সময়কালকে। সাধারণভাবে 'প্রাচীন', 'মধ্য' ও 'আধুনিক'— এই তিন যুগে ইতিহাসের সময়কে ভাগ করা হয়। সেই অর্থে যে হাজার বছরের কথা এখানে আলোচনা করা হবে, সেটা মধ্যযুগে পড়ে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এভাবে যুগের পাঁচিল তুলে ইতিহাসকে ভাগ করা যায় না। হঠাৎ করে কোনো এক দিন সকাল থেকে একটি যুগ শেষ হয়ে আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায় না।

তাহলে কীভাবে বোঝা যায় কোন সময়টি কোন যুগে পড়বে? আসলে মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দেশশাসন, যুদ্ধ, পড়াশোনা— এসব কাজের এক একটি বিশেষ দিক এক এক সময়ে দেখা যায়। সেগুলির তফাত থেকেই যুগ ভাগ করা রেওয়াজ আছে। তাহলে কেমন ছিল মধ্যযুগের ভারত? আগে অনেকে বলতেন, সেসময়ে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল মানুষের জীবন। কোনো কিছুতেই নাকি কোনো উন্নতি হয়নি। তবে আজকাল আর সেকথা মানা হয় না। টুকরো টুকরো উপাদান জুড়ে ঐতিহাসিকরা সেসময়ের ইতিহাস লিখেছেন। তাতে দেখা যায়, তখন জীবনের নানান দিকে অনেক কিছুরই উন্নতি করেছিল ভারতের মানুষ। এই বইতে সেসব উন্নতির কথাও তোমরা জানতে পারবে।

এক দিকে ছিল নানান নতুন যন্ত্র ও কৌশলের ব্যবহার। কুয়ো থেকে জল তোলা, তাঁত বোনা বা যুদ্ধের অস্ত্র— বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছিল অনেক কিছুই। অনেক নতুন খাবার ও পানীয়ের কথা এই সময় জানতে পারে ভারতের লোক। এর সবচেয়ে মজার উদাহরণ হলো রান্নায় আলুর ব্যবহার। পোর্তুগিজদের হাত ধরে এদেশে আলু খাওয়ার চল শুরু হয়।

দেশ শাসনে আর রাজনীতিতেও নতুন অনেক দিক দেখা গিয়েছিল। শুধু রাজ্য বিস্তার নয়, জনগণের ভালো-মন্দের কথাও শাসকদের ভাবতে হয়েছিল। কখনও রাজার শাসন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আবার কখনও সব ক্ষমতা একজন শাসকই হাতে তুলে নিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে একদিকে ছিল কৃষি, অন্যদিকে ব্যাবসা-বাণিজ্য। তৈরি হয়েছিল নতুন নতুন শহর। বন কেটে চাষবাস করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

ধর্মভাবনায় বেশ কিছু নতুন পথের হদিশ সেসময়ের মানুষ পেয়েছিল। আচার-অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর নয়, ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়ার কথা বলা

টুকরো কথা

আদি-মধ্যযুগ

রাতারাতি ইতিহাসের যুগ বদলে যায় না। ধরো দুপুরবেলার কথা। সেটা না সকাল না বিকেল। তেমনই ভারতের ইতিহাসে একটা বড়ো সময় ছিলো, যখন প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে আর মধ্যযুগও পুরোপুরি শুরু হয়নি। ঐতিহাসিকরা সেই সময়টিকে বলেন আদি- মধ্যযুগ।

হয়েছিল। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাই হয়ে উঠেছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যম। তার ফলে ভারতের নানান অঞ্চলে আঞ্চলিক অনেক ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ হয়। পাশাপাশি ছিল নানা ধরনের শিল্পচর্চা।

কিন্তু শিল্প হোক বা সাহিত্য— সবেতেই সাধারণ গরিব মানুষের কথা খুব বেশি ছিল না। সেসবের বেশির ভাগই ছিল শাসকের গুণগানে ভরা। সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকতো শাসকের নাম। তাই বলা হয়— চোল রাজারা মন্দির বানিয়েছেন। অথবা তাজমহল বানিয়েছেন সম্রাট শাহজাহান। অসংখ্য সাধারণ কারিগর এবং শিল্পী যারা মন্দিরগুলি এবং তাজমহল বানালেন, তাঁদের বেশির ভাগের নাম আমরা জানি না।

১.৪ ইতিহাসের গোয়েন্দা

ইতিহাস বই পড়তে সবসময় ভালো না লাগলেও, গোয়েন্দা গল্প পড়তে তোমাদের নিশ্চয় ভালো লাগে। আসলে ঐতিহাসিকও একজন গোয়েন্দা। গল্পের গোয়েন্দা টুকরো টুকরো সূত্র (Clue/ক্লু) খুঁজে বের করেন। তারপর যুক্তি দিয়ে সূত্রগুলির ঠিক-ভুল বিচার করেন। শেষে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা তুলে ধরেন। তেমনি ঐতিহাসিকও টুকরো টুকরো সূত্র খোঁজেন। সেগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন। তারপরে সূত্রগুলি সাজিয়ে অনেককাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা সময়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আর যেখানে সূত্রের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

গোটা বছর জুড়ে এই বইটি পড়ার সময়ে তোমরাও এক এক জন ঐতিহাসিক বা গোয়েন্দা হয়ে ওঠো। খুঁটিয়ে দেখো সূত্রগুলি। অনেক জায়গায় ফাঁক আছে। চেষ্টা করো যুক্তি দিয়ে সেগুলির ভরাট করার। খুঁজে দেখো নতুন কোনো সূত্র পাও কি না। তাহলে দেখবে ইতিহাস পড়তে গিয়ে তোমরা এক একজন ইতিহাসের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছো। তখন ইতিহাস পড়তে আরো ভালো লাগবে।

ভেবে বলোতো ইতিহাসে অনেক সময়েই কেন সাধারণ মানুষ বা কারিগর ও শিল্পীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না?

তোমার পাতা

ইতিহাসের গোয়েন্দা হিসাবে হাত পাকানোর জন্য সামনের আটটি অধ্যায় রইল। ঐ আটটি অধ্যায়ে যা যা সূত্র পাবে সেসব এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর জুড়ে .....

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

আমরা ভারতের অধিবাসী। ভারতের যে অংশে আমরা থাকি তার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এই নামটি বেশি দিনের পুরোনো নয়। এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব এই জায়গাটি অনেক কাল আগে কী নামে পরিচিত ছিল, এর ভৌগোলিক সীমানা কী ছিল, এর বিভাগগুলি কী ছিল, কারা এখানে শাসন করতেন, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ইত্যাদি। এর জন্য আমরা ফিরে যাব অনেক কাল আগের কথায়। সে সময় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন আজকের তুলনায় অনেক আলাদা ছিল।

২.১ প্রাচীন বাংলা

প্রথমে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম্বন্ধে জানব। এখানে মনে রাখতে হবে যে এসব হলো এক-দেড় হাজার বছরেরও বেশি আগেকার কথা। এই ভৌগোলিক বিভাগগুলির সীমানা সব সময় এক থাকেনি। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা নানান সময়ে আলাদা-আলাদা ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

টুকরো কথা

বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ। প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ বলতে যে অঞ্চলটিকে বোঝানো হতো তা ভৌগোলিকভাবে খুব বড়ো কোনো এলাকা ছিল না। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির মধ্যে বঙ্গ ছিল একটি বিভাগ মাত্র। মহাভারতে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদিকে একেকটি আলাদা রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যেও বঙ্গ ও সুহ্ম নামদুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক মিনহাজ ই-সিরাজের লেখাতেও বঙ্গ রাজ্যের কথা আছে। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি গ্রন্থে এই অঞ্চলকে ***সুবা বাংলা*** *বলে উল্লেখ করেছেন। সুবা মানে প্রদেশ বা রাজ্য।*

*ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকরা এখানে এসেছিলেন। তাঁরা এই দেশের নাম দিয়েছিলেন **বেঙ্গালা**। স্বাধীনতার আগে এই বিরাট ভূখণ্ড **বাংলা** বা **বাংলাদেশ** বা **বেঙ্গল** নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের সময় বাংলার পশ্চিম ভাগের নাম হলো **পশ্চিমবঙ্গ**। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য। ঐ সময় পূর্ব বাংলা চলে গেল নতুন দেশ পাকিস্তানে। পরে তার নাম হলো **পূর্ব পাকিস্তান**। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হলো। তার নতুন নাম হলো **বাংলাদেশ**।*

এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র নাও। এখন পশ্চিমবঙ্গে ক-টি জেলা? কোন জেলায় তোমার বাড়ি? সেই জেলাটি ২.১ মানচিত্রের কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

প্রাচীন বাংলার সীমানা প্রধানত তিনটি নদী দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই নদীগুলি হলো ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা (***২.১ মানচিত্র দেখো***)। বাংলার একেকটি অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন ছিল। আবার, কয়েকটি অঞ্চল অন্য কোনো অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। যখন কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা রাজ্যবিস্তার করতেন তখন সেই অঞ্চলের সীমানাও বদলে যেত।

প্রাচীন বাংলার প্রধান অঞ্চলগুলি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, সমতট ও হরিকেল। সাধারণভাবে কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের নাম অনুসারে জায়গার নাম হতো। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি নামগুলি এক একটি জনগোষ্ঠীর নাম। তারা যে অঞ্চলে থাকত, সেই অঞ্চলটির নাম হতো তাদের নাম অনুযায়ী।

পুণ্ড্রবর্ধন : পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহি এবং পাবনা জুড়ে ছিল। এক সময় শ্রীহট্টও (সিলেট) এর ভিতরে ছিল। গুপ্ত যুগে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি *ভুক্তি* বা শাসন-এলাকা।

বরেন্দ্র : ভাগীরথী ও করতোয়া নদীর মধ্যের এলাকা বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ : প্রাচীন কালে পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মাঝে ত্রিভুজের মতো দেখতে ব-দ্বীপ এলাকাকে বঙ্গ বলা হতো। সম্ভবত ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের এলাকাও এর মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে রাঢ় এবং সুহ্ম নামে দুটো আলাদা অঞ্চলের উৎপত্তি ঘটলে বঙ্গের সীমানাও বদলে যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে বঙ্গ বলতে এখনকার বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুর, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলকে বোঝানো হতো।

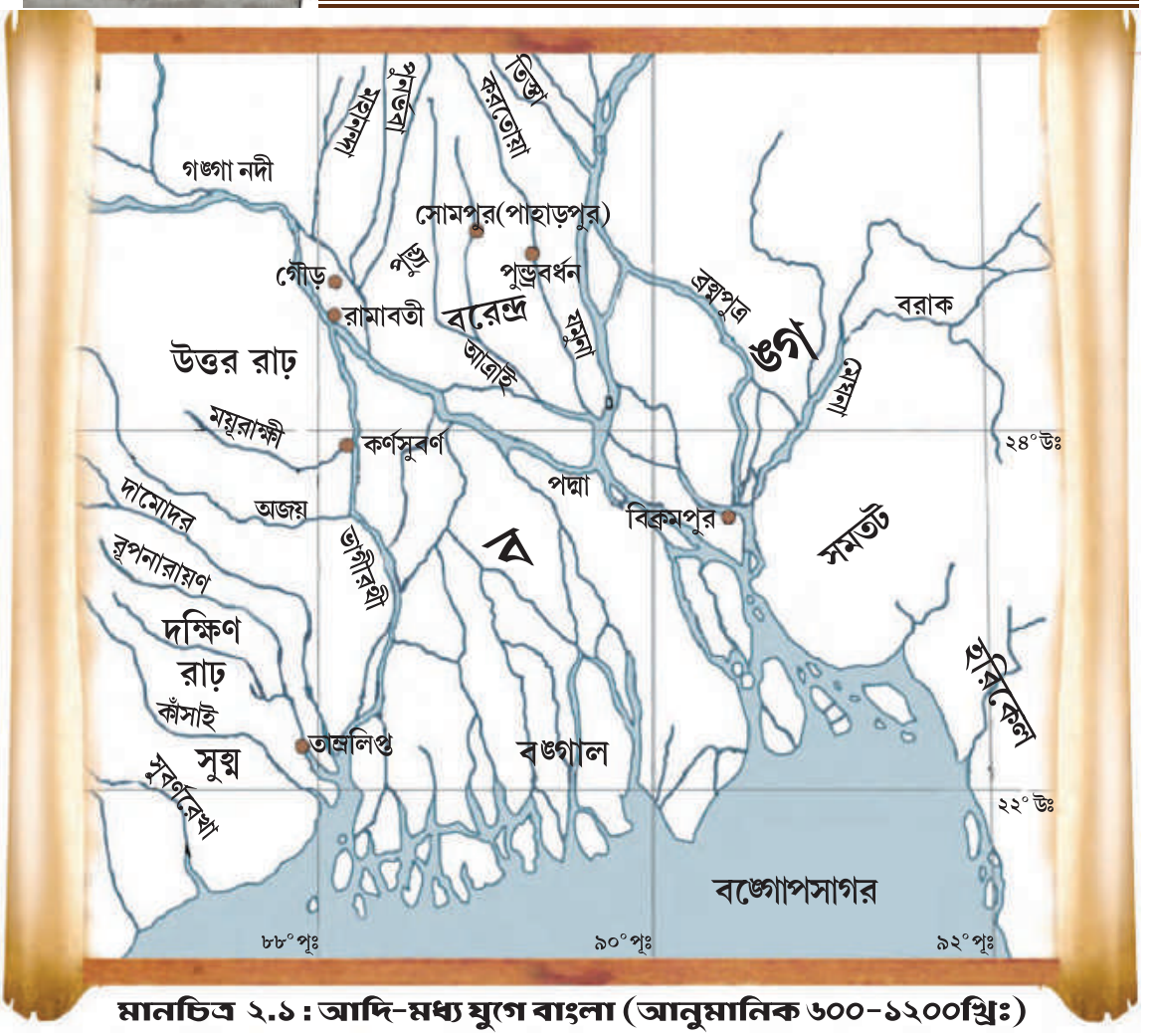

মানচিত্র ২.১ : আদি-মধ্য যুগে বাংলা (আনুমানিক ৩০০-১২০০খ্রিঃ)

বঙ্গাল : বঙ্গাল অঞ্চল বলতে বঙ্গের দক্ষিণ সীমানাবর্তী বঙ্গোপসাগরের উপকূলকে চিহ্নিত করা হতো।

রাঢ়-সুহ্ম : প্রাচীন রাঢ় বা লাঢ় অঞ্চলের দুটি ভাগ ছিল। উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়। জৈনদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে উত্তর রাঢ় ছিল বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) এবং দক্ষিণ রাঢ় ছিল সুব্ভভূমি (সুহ্মভূমি) এলাকা। উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ়ের মাঝের সীমানা ছিল অজয় নদ। আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম ভাগ, বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনার একাংশ এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তর ভাগ ছিল উত্তর রাঢ় অঞ্চল। দক্ষিণ রাঢ় বলতে আজকের হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমান জেলার বাকি অংশ এবং অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বিরাট এলাকাকে বোঝানো হতো। দক্ষিণ রাঢ় ছিল বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এলাকা। মহাভারতের গল্পে এবং কালিদাসের কাব্যে আছে যে ভাগীরথী এবং কাঁসাই (কংসাবতী) নদীর মাঝে সমুদ্র পর্যন্ত বিরাট এলাকা এর অন্তর্গত ছিল।

রাঢ় অঞ্চল বলতে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলকে বোঝায়? সেই অঞ্চলে কী কী নদী আজও আছে?

গৌড় : প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলায় গৌড় ছিল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। গৌড় বলতে একটি জনগোষ্ঠীকেও বোঝানো হতো। বরাহমিহিরের (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) রচনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিম ভাগ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেকালের গৌড়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের সীমা বেড়ে গিয়েছিল। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে আজকের মুর্শিদাবাদ জেলাই ছিল সেকালের গৌড়ের প্রধান এলাকা। শশাঙ্কের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) থেকে ওড়িশার উপকূল পর্যন্ত এলাকা গৌড়ের অন্তর্গত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে গৌড় বলতে সমগ্র পাল সাম্রাজ্যকেও বোঝানো হতো।

সমতট : প্রাচীন সমতট ছিল মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের এলাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের সমভূমিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল প্রাচীন সমতট অঞ্চল। মেঘনা নদী সমতটকে বাংলার বাকি অঞ্চলের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। এই কারণে সমতটকে প্রাচীন ইতিহাসে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা বলে ধরা হতো।

হরিকেল : সমতটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আজকের বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল প্রাচীন যুগে হরিকেল নামে পরিচিত ছিল।

এবারে আসা যাক বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা শশাঙ্কের কথায়।

২.২ শশাঙ্ক

শশাঙ্ক ছিলেন এক গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত। ৬০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু কাল আগে তিনি গৌড়ের শাসক হন। শশাঙ্কের শাসনের ষাট-সত্তর বছর আগে থেকেই গৌড় ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের ক্ষমতা আরও বেড়েছিল। ৬৩৭-'৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন শাসক ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

শশাঙ্কের শাসনকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি (মালব, কনৌজ, স্থানীশ্বর বা থানেসর, কামরূপ, গৌড় প্রভৃতি) নিজ-নিজ স্বার্থে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখত। শশাঙ্ক সেই দ্বন্দ্বে অংশ নেন। সেভাবে উত্তর-পশ্চিম বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। শশাঙ্ক সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং ওড়িশার একাংশ নিজের অধিকারে আনতে পেরেছিলেন। উত্তর ভারতের ক্ষমতাধর রাজ্যগুলির সঙ্গে লড়াই করে শশাঙ্ক গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

টুকরো কথা

কর্ণসুবর্ণ : প্রাচীন বাংলার নগর

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) রেলস্টেশনের কাছে রাজবাড়িডাঙায় প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। চিনা বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। এর কাছেই ছিল সেকালের গৌড়ের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণ। চিনা ভাষায় এই বৌদ্ধবিহারের নাম ***লো-টো-মো-চিহ্।*** *সুয়ান জাং তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) থেকে এখানে এসেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ স্থানীয় ভাবে রাজা কর্ণের প্রাসাদ নামে পরিচিত।*

সুয়ান জাং লিখেছেন যে, এই দেশটি জনবহুল এবং এখানকার মানুষেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে জমি নীচু ও আর্দ্র, নিয়মিত কৃষিকাজ হয়, অঢেল ফুল-ফল পাওয়া যায়, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং এখানকার মানুষজনের চরিত্র ভালো ও তাঁরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ এবং শৈব উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বসবাস করত।

কর্ণসুবর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। আশ-পাশের গ্রাম থেকে এখানকার নাগরিকদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসত। শশাঙ্কের আমলের অনেক আগে থেকেই সম্ভবত এই অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। রক্তমৃত্তিকা থেকে জনৈক বণিক জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় অঞ্চলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল এমন নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এর থেকে কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কর্ণসুবর্ণের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটেছে বারবার। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এই শহর অল্প সময়ের জন্য কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার হাতে চলে যায়। এর পর কিছু কাল এটি জয়নাগের রাজধানী ছিল। তবে সপ্তম শতকের পরে এই শহরের কথা আর বিশেষ জানা যায় না। পাল এবং সেন যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিতে এর কোনো উল্লেখ নেই।

ছবি : ২.১ রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, কর্ণসুবর্ণ, পশ্চিমবঙ্গ

শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থানীশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় শাসক হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। *সকলোত্তরপথনাথ* উপাধিধারী হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে হারাতে পারেননি।

শশাঙ্ক ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন শৈব বা শিবের উপাসক। *আর্যমঞ্জু শ্রীমূলকল্প* নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং *সুয়ান জাং*-এর ভ্রমণ বিবরণীতে তাঁকে 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' বলা হয়েছে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হত্যা করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় স্মারক ধ্বংস করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচনা *হর্ষচরিত*-এ শশাঙ্ককে নিন্দা করা হয়েছে।

অন্যদিকে শশাঙ্কের শাসনকালের কয়েক বছর পরে *সুয়ান জাং* কর্ণসুবর্ণ নগরের উপকণ্ঠে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর চিনা পর্যটক ই-ৎসিঙ্-এরও নজরে পড়েছিল বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি। শশাঙ্ক নির্বিচারে বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে তা হতো না। বলা যায় যে, শশাঙ্কের প্রতি সব লেখকরা পুরোপুরি বিদ্বেষমুক্ত ছিলেন না। সুতরাং, শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁদের মতামত কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

শশাঙ্কের শাসনকালে গৌড়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে বলা যায় *গৌড়তন্ত্র*। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের কর্মচারী বা আমলারা একটা নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী গড়ে তুলেছিল। আগে যা ছিল গ্রামের স্থানীয় লোকের কাজ, শশাঙ্কের সময় সেই কাজে প্রশাসনও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। অর্থাৎ, ঐ আমলের গৌড় রাজ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে সরকার পরিচালনা করা হতো।

শশাঙ্কের আমলে সোনার মুদ্রা প্রচলিত ছিল (***২.২ ছবি দেখো***)। কিন্তু তার মান পড়ে গিয়েছিল। নকল সোনার মুদ্রাও দেখা যেত। রুপোর মুদ্রা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যুগে সম্ভবত মন্দা দেখা দিয়েছিল। সমাজে জমির চাহিদা বাড়তে থাকে। অর্থনীতি হয়ে পড়ে কৃষিনির্ভর। বাণিজ্যের গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে নগরের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। আবার কৃষির গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় সমাজ ক্রমশ গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। সমাজে *মহত্তর* বা স্থানীয় প্রধানদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের গুরুত্ব ও ক্ষমতা আগেকার যুগের থেকে কমে এসেছিল। স্থানীয় প্রধানরা এ যুগে শ্রেষ্ঠীদের মতোই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল।

এ যুগে বঙ্গ এবং সমতটের শাসকরা প্রায় সকলেই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী। বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং শিব পুজোর প্রথা ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে বৌদ্ধধর্ম বাংলার রাজাদের সমর্থন পায়নি। পরবর্তীকালে (খ্রিস্টীয়

টুকরো কথা

গৌড়বহো (গৌড়বধ)

কনৌজের শাসক যশোবর্মা বা যশোবর্মনের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ ৭২৫-'৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রাকৃত ভাষায় গৌড়বহো কাব্য রচনা করেছিলেন। যশোবর্মন মগধের রাজাকে পরাজিত করার পর কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। মনে হয় যে, মগধের রাজা বলতে গৌড়ের রাজাকেই বোঝানো হয়েছে।

ছবি : ২.২ শশাঙ্কের মুদ্রা

অষ্টম-নবম শতকে পাল আমলে) বৌদ্ধধর্ম আবার রাজার সমর্থন পেয়েছিল।

শশাঙ্ক কোনো স্থায়ী রাজবংশ তৈরি করে যেতে পারেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ের ক্ষমতা নষ্ট হয়। বাংলায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর বছর দশেক পরে হর্ষবর্ধনও মারা যান। বাংলার নানা অংশ প্রথমে কামরূপের রাজা এবং পরে নাগ সম্প্রদায়ের জয়নাগ এবং তিব্বতের শাসকরা অধিকার করেন। অষ্টম শতকে কনৌজ এবং কাশ্মীরের শাসকরা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এই বিশৃঙ্খল সময়কে বলা হয় **মাৎস্যন্যায়ের** যুগ।

তোমার চেনা কোনো পশুর ছবি কি ২.২-এর মুদ্রায় দেখতে পাচ্ছ? কেন ঐ পশুর ছবি এই মুদ্রায় আছে বলে মনে হয়?

টুকরো কথা

মাৎস্যন্যায়

মাৎস্যন্যায় বলতে দেশে অরাজকতা বা স্থায়ী রাজার অভাবকে বোঝানো হয়। পুকুরের বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, অরাজকতার সময়ে তেমনি শক্তিশালী লোক দুর্বল লোকের ওপর অত্যাচার করে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একশো বছর ছিল বাংলার ইতিহাসে একটা পরিবর্তনের যুগ। ঐ যুগে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক ইচ্ছামতো নিজের নিজের এলাকা শাসন করত। বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসক ছিল না।

বছরের পর বছর এই অবস্থা চলার পরে বাংলার প্রভাবশালী লোকেরা মিলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচন করে (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ সময় থেকে বাংলায় পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

২.৩ বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল : খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত

পাল রাজাদের আদি নিবাস ছিল সম্ভবত বরেন্দ্র অঞ্চলে। পাল শাসনের প্রথম একশো বছর (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে নবম শতকের মধ্যভাগ) তাদের ক্ষমতা বিস্তারের সময়। এর পরের প্রায় একশো তিরিশ বছর ধরে (খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে দশম শতকের শেষভাগ) পালদের ক্ষমতা কমতে থাকে। আবার, দশম শতকের শেষ দিক থেকে পালদের ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-'৭৪ খ্রিঃ)। বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে তিনি নিজের শাসনের আওতায় এনেছিলেন। গোপালের উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭৪-৮০৬ খ্রিঃ) উত্তর ভারতের কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম চলেছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপালের ছেলে দেবপাল (আনুমানিক ৮০৬-'৪৫ খ্রিঃ) উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজাদের মতোই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে অন্তত বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজদেশ থেকে পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেবপালের পরে পালদের ক্ষমতা কমতে শুরু করে। এর কারণ ছিল পালদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল। এ ছাড়া, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, পশ্চিম ভারতের প্রতিহার এবং ওড়িশার শাসকরা নবম শতকে বাংলা এবং বিহারের অনেক এলাকা জয় করেছিল। বাংলায় পালদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্য মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আবার, রাজা প্রথম মহীপালের সময় (আনুমানিক ৯৭৭-১০২৭ খ্রিঃ) পালশাসনের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

একাদশ শতকের শেষ দিকে রামপাল রাজা হন (আনুমানিক ১০৭২-১১২৬ খ্রিঃ)। কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল পালদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। রামপাল তা উদ্ধার করতে সফল হন। তিনি পালদের ক্ষমতাকে কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলায় পালরাজত্ব কার্যত শেষ হয়ে যায়।

পাল আমলের শাসনব্যবস্থায় সামন্ত নেতাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সব সামন্ত নেতাদের পাল আমলের বিবরণীগুলিতে রাজন, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় এরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

টুকরো কথা

পাল রাজাদের তারিখ

মালদহ জেলার হবিবপুর ব্লকের জগজ্জীবনপুরে পালযুগের একটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে। সেখানে পাওয়া তামার লেখ থেকে জানা গেছে যে দেবপালের পরে তার বড়ো ছেলে মহেন্দ্রপাল রাজা হয়েছিলেন (৮৪৫-'৬০ খ্রিঃ)। আগে ভাবা হতো যে মহেন্দ্রপাল ছিলেন পশ্চিম ভারতের প্রতিহার বংশের রাজা। মহেন্দ্রপালের কথা জানার পরে দেবপাল-পরবর্তী পাল রাজাদের শাসন কালের তারিখ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলে গেছে।

টুকরো কথা

কৈবর্ত বিদ্রোহ

পালশাসনে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল। কৈবর্তরা ছিল সম্ভবত নৌকার মাঝি বা জেলে। সে সময়ে বাংলার উত্তর ভাগে কৈবর্তদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ আছে। এই বিদ্রোহের তিনজন নেতা ছিলেন: দিব্য (দিব্বোক), রুদোক এবং ভীম। দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১০৭০-'৭১ খ্রিঃ) দিব্য ছিলেন পালরাষ্ট্রেরই কর্মচারী। পালদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি বিদ্রোহ করেন। মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্র দখল করে সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। এই বিদ্রোহ কত বড়ো আকার ধারণ করেছিল, বা দিব্যর সঙ্গে কতজন সামন্ত যোগ দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় না। মহীপালের ছোটো ভাই রামপাল দিব্যকে দমন করে বরেন্দ্র উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। কৈবর্ত রাজা ভীমও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। এ সময়ে পাল রাজাদের শাসন উত্তর বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রামপাল বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন সামন্ত-নায়কদের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। তারপর তিনি বরেন্দ্র-সহ বাংলার কামরূপ এবং ওড়িশার একাংশে পাল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে রামাবতী নগরে রামপালের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহ পাল শাসনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা জানা যায় রামচরিত কাব্য থেকে। এ সম্বন্ধে আমরা পরের অধ্যায়ে পড়ব।

২.৪ বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল

বাংলার সেন রাজারা খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে শাসন শুরু করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতক শুরু হওয়ার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সেন শাসন শেষ হয়ে যায়।

সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল, অর্থাৎ মহীশূর এবং তার আশেপাশের এলাকা। সেনরা বংশগতভাবে প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে তাঁরা ক্ষত্রিয় হয়ে যান। সেন বংশের সামন্তসেন একাদশ শতকের কোনো এক সময়ে কর্ণাট থেকে রাঢ় অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেনের আমলে রাঢ় অঞ্চলে সেনদের কিছুটা আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। হেমন্তসেনের ছেলে বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৬-১১৫৯ খ্রিঃ) রাঢ়, গৌড়, পূর্ব বঙ্গ এবং মিথিলা জয় করে সেন-রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছিলেন।

পরবর্তী শাসক বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৯-'৭৯ খ্রিঃ) পাল রাজা গোবিন্দপালকে পরাস্ত করেছিলেন। এভাবে বল্লালসেন পালরাজত্বের ওপর চূড়ান্ত আঘাত করেন। বল্লালসেন সমাজ-সংস্কার করে রক্ষণশীল, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বল্লালসেনের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৪/৫ খ্রিঃ) প্রয়াগ, বারাণসী এবং পুরীতে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) ছিল ওই আমলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণ ঘটলে বাংলায় সেন শাসনের কার্যত অবসান ঘটেছিল।

ছক ২.১ : এক নজরে বাংলা ও বিহারে পাল ও সেন রাজাদের শাসন

রাজবংশ	সময়কাল	কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসক	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
পাল	৭৫০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ	গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, রামপাল	ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা, শিক্ষা-শিল্প-স্থাপত্যের বিকাশ, কৈবর্ত বিদ্রোহ
সেন	খ্রিস্টীয় একাদশ শতক–১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ)	বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন	বর্ণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি, তুর্কি অভিযান

লক্ষ করে দেখো যে, পাল রাজাদের শাসনের শেষ দিকেই বাংলায় সেন শাসন শুরু হয়। তার মানে হলো, খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বাংলার উপরে আর পাল রাজাদের কর্তৃত্ব তেমন ভাবে ছিল না। কেবল পূর্ব বিহারে এবং উত্তর বাংলায় পাল রাজাদের শাসন টিকে ছিল। এই সুযোগে সেন বংশের সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল শাসনের শেষ দিকে কৈবর্ত বিদ্রোহ সেনদের রাজ্যস্থাপনে সাহয্য করেছিল।

২.৪ অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

এতক্ষণ আমরা বাংলার কথা পড়লাম। বাংলার বাইরে খ্রিস্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু নতুন রাজবংশ এবং রাজত্বের উত্থান হয়েছিল। এই নতুন রাজবংশগুলি স্থানীয় শক্তিশালী

ব্যক্তিদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল। বড়ো বড়ো জমির মালিক বা যোদ্ধৃনেতাদের অনেক ক্ষেত্রে সামন্ত, মহাসামন্ত বা মহা-মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হতো। তার বদলে এঁরা রাজা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খাজনা ও উপঢৌকন দিত। এমনকি প্রয়োজনে রাজার ডাকে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে হাজির হতো। কখনও আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে শুরু করেছিল। যেমন, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা কর্ণাটকের চালুক্যশক্তির অধীন ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক রাষ্ট্রকূট নেতা দন্তিদুর্গ চালুক্য শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেই স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। অনেক সময় সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী মানুষেরা পারিবারিক শক্তির সাহায্যে নতুন রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হতো। এইরকম কয়েকটি রাজবংশের কথা এখানে আমরা জানব।

প্রথমে উত্তর ভারত দিয়ে শুরু করা যাক। বাংলা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। দ্বিতীয় শক্তি ছিল গুর্জর-প্রতিহার। এঁরা রাজস্থান ও গুজরাটের বৃহৎ অঞ্চল শাসন করতেন। এদের মধ্যে রাজা ভোজ (৮৩৬-'৮৫ খ্রিস্টাব্দ) খুব ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি কনৌজ দখল করে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, বহু আক্রমণের মুখে প্রতিহাররা দুর্বল হয়ে পড়ে।

হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই কনৌজ উত্তরাপথের অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যে কনৌজ নিয়ন্ত্রণ করবে সেই গাঙ্গেয় উপত্যকা দখলে রাখতে পারবে তা বোঝা গিয়েছিল। এই অঞ্চলের নদী-ভিত্তিক বাণিজ্য এবং খনিজ দ্রব্য আর্থিক দিক থেকে লোভনীয় ছিল। কনৌজ শেষ পর্যন্ত কে দখলে রাখতে পারবে, এই নিয়ে অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে টানা লড়াই চলেছিল। একেই *ত্রি-শক্তি সংগ্রাম* বলা হয়। প্রায় দুশো বছর ধরে চলা যুদ্ধ-কলহে তিনটি বংশেরই শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে পাল রাজাদের ক্ষমতা কমে গেলে বাংলায় সেন রাজত্ব শুরু হয়েছিল।

২.৬ দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতেও বেশ কিছু আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল। পল্লব, পাণ্ড্য এবং বিশেষত চোলরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির ব-দ্বীপকে ঘিরে চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানকার রাজা মুট্টাবাইয়াকে সরিয়ে বিজয়ালয় (৮৪৬-৮৭১ খ্রিঃ) চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর নামে এক নতুন নগরী তৈরি হয় যা চোলদের

টুকরো কথা

রাজপুত্র

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের কথা বারবার বলা হয় তারা হলো রাজপুত। রাজপুত কারা, এদের দেশ কোথায়—এসব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে হূণদের আক্রমণের পরে বেশ কিছু মধ্য-এশীয় উপজাতির মানুষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাহও হয়। এদের বংশধরদের রাজপুত বলা হয়। তবে রাজপুতরা নিজেদেরকে স্থানীয় ক্ষত্রিয় বলে মনে করত। নিজেদের চন্দ্র, সূর্য বা অগ্নি দেবতার বংশধর বলে মনে করত তারা।

রাজধানী ছিল। বিজয়ালয়ের উত্তরসূরিরা রাজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করেন। দক্ষিণের পাণ্ড্য এবং উত্তরের পল্লব অঞ্চল চোলদের দখলে আসে। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজরাজ বর্তমান কেরল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল প্রতিপত্তি বাড়ান। তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৬-১০৪৪ খ্রিঃ) কল্যাণীর চালুক্যশক্তিকে পরাজিত করেন। বাংলার পালবংশের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গঙ্গা নদীর তীরে পালরাজাকে হারিয়ে তিনি *গঙ্গাইকোণ্ডচোল* উপাধি নেন। প্রথম রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোল দুজনেই দক্ষ নৌবাহিনী তৈরি করেন। তার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা চোলদের পক্ষে সম্ভব হয়।

মানচিত্র : ২.২ : খ্রিস্টীয় নবম শতকের ভারতবর্ষ

২.৭ ইসলাম ও ভারত

এতক্ষণ আমরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু কথা পড়লাম। এই সময়েই ভারতের সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ভারতের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর এই যোগাযোগের গভীর প্রভাব পড়েছিল।

ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগে আরব উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশই মরুভূমি বা শুকনো ঘাসজমি অঞ্চল। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর। এখানে বৃষ্টিপাত সামান্যই হয়। মক্কা এবং মদিনা এখানকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার যাযাবর মানুষদের বলা হতো বেদুইন। তারা উট পালন করত। খেজুর এবং উটের দুধ ছিল এদের অন্যতম খাদ্য। এই মানুষেরা নিজেদের আরব বলে পরিচয় দিত।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শুরুতে, কিছু কিছু আরব উপজাতি ব্যবসাকেই প্রধান জীবিকা করেছিল। মক্কা শহর দুটি বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই নগরের দখলদারি নিয়ে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে নতুন এক ধর্মের জন্ম হলো। তার নাম ইসলাম। ঐ শতকে হজরত মহম্মদ মক্কাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোষণা করেন যে আল্লাহ্ বা ঈশ্বর তাঁকে দূত মনোনীত করেছেন। সে জন্যই মহম্মদকে ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বলা হয়। আল্লাহর বাণী সাধারণ মানুষ মহম্মদের থেকেই জানতে পারেন। ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত।

বিভিন্ন আরব উপজাতিদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ বন্ধ করার জন্য মহম্মদ একটি বিশ্বাসকেই চালু করেছিলেন। ফলে উপজাতিগুলির মধ্যে ঐক্য তৈরি হতে থাকে। তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠিত মক্কাবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণের সাথে মহম্মদের ধর্মীয় মতের যথেষ্ট ফারাক ছিল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীরা মদিনা শহরে চলে আসেন। মক্কা থেকে মদিনায় এই চলে যাওয়াকে আরবি ভাষায় হিজরত বলা হয়। পরে ঐ সময় থেকে হিসাব করেই *হিজরি* নামেই ইসলামীয় সাল গণনা শুরু হয়। দশ বছরের মধ্যেই মহম্মদ আরব ভূখণ্ডের বিরাট অঞ্চল জয় করেন। মক্কাতেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদ পরলোক গমন করেন। ততদিনে অবশ্য আরবের মূল ভূখণ্ডে ইসলাম ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

ভারত ও আরব সভ্যতা

ভারতের সঙ্গে ইসলামের প্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল তুর্কিরা এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে আরব বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসতেন। সিন্ধু মোহনায়, মালাবারে আরবি মুসলিম বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এর থেকে যেমন আরবি বণিকরা লাভবান হয়েছিল, তেমনি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভ করত। শাসকরাও এর থেকে লাভবান হয়েছিল। হিন্দু, জৈন এবং মুসলিম বণিকদের এই বাণিজ্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঐ যুগে বাগদাদের খলিফাদের উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

টুকরো কথা

খলিফা ও খিলাফৎ

মহম্মদের পর ইসলাম জগতের নেতৃত্ব কে দেবেন— তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন মহম্মদের প্রধান চার সঙ্গীরা একে একে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। এদের বলা হয় *খলিফা*। খলিফা শব্দটা আরবি। তার মানে প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর। খলিফাই হলেন ইসলামীয় জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। যেসব অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলি হলো *দার-উল ইসলাম*। খলিফা এই পুরো দার-উল ইসলামের প্রধান নেতা। তাঁর অধিকারের অঞ্চলের নাম *খিলাফৎ*।

৭১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরবি মুসলমানরা মহম্মদ বিন কাশেমের নেতৃত্বে সিন্ধু প্রদেশে অভিযান করেন। ইতোমধ্যে আরব ব্যবসায়ী এবং পর্যটকরা খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকেই ভারতে এসেছিলেন। অর্থাৎ, ভারতের সঙ্গে ইসলামের পরিচয় রাজ্যবিস্তারের আগেই শুরু হয়েছিল।

আরব শক্তি সিন্ধু প্রদেশ, মুলতান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অঞ্চল দখল করে। বিন কাশেমের মৃত্যুর পর তারা ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল থেকে সরে যেতে থাকে। আরবরা নবম শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে অভিযান বন্ধ করে দেয়।

আরবদের পর, আরেক মুসলমান শক্তি তুর্কিরা ভারতের সম্পদের টানে ভারত আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মাহমুদ এবং ঘুরের শাসক মুইজউদ্দিন মহম্মদ বিন সাম (মহম্মদ ঘুরি)—এই দুই তুর্কি শাসক ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয় অভিযানে আসেন। অবশ্য উভয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল না। গজনির মাহমুদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরগুলি থেকে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁর সাম্রাজ্যে তা ব্যয় করা। আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাহমুদ প্রায় সতেরোবার উত্তর ভারত আক্রমণ করেন।

টুকরো কথা

গজনির সুলতান মাহমুদ

সুলতান মাহমুদ ভারতের ইতিহাসে একজন আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু তিনি শুধুই একজন যোদ্ধা ছিলেন না। ভারত থেকে তিনি যেমন প্রচুর সম্পদ লুঠ করেছেন, তেমনি নিজের রাজ্যে ভালো কাজে তা ব্যয় করেছেন। তাঁর আমলে রাজধানী গজনি এবং অন্যান্য শহরকে

টুকরো কথা

কোরান ও কাবা

ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কোরান। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে কোরান আল্লাহ্‌র বাণী।

*মক্কায় **মসজিদ-ই হরম** নামে একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদের মাঝখানে **কাবা** নামে একটি পবিত্র ভবন আছে। এরই আরেক নাম **বাইতুল্লাহ**। এই ভবনের এক কোণে কালো রং-এর একটি ছোটো পাথর আছে, যাকে **হাজার উল আসওয়াদ** বলা হয়। কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে থেকেই আরবদের তীর্থক্ষেত্র ছিল কাবা শরীফ। পরবর্তীকালে কাবা শরীফ ইসলামের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।*

সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মাহমুদ সেখানে প্রাসাদ, মসজিদ, গ্রন্থাগার, বাগিচা, জলাধার, খাল এবং আমু দরিয়ার (নদী) উপর বাঁধ নির্মাণ করেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন যেখানে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাহমুদের আমলে দুজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন অল বিরুনি এবং ফিরদৌসি। অল বিরুনি ছিলেন দর্শন এবং গণিতে পণ্ডিত। ভারতে তিনি পর্যটক হিসাবে আসেন। তাঁর লেখা কিতাব অল-হিন্দ সে সময়ের ভারতের ইতিহাস জানার জন্য জরুরি গ্রন্থ। কবি ফিরদৌসি, শাহনামা কাব্য লিখেছিলেন।

অন্যদিকে মহম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষের শাসক হতে চেয়েছিলেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তিনি রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হারিয়ে দেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি মারা যান। ঘুরির অন্যতম সঙ্গী কুতুবউদ্দিন আইবক সেই সময়ে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় তুর্কি অভিযান

আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল।

টুকরো কথা

মাত্র আঠারোজন ঘোড়সওয়ার মিলে বাংলা জয়! তা-ও কি হয়?

তুর্কি আক্রমণের প্রায় চল্লিশ বছর পরে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ বাংলায় এসে বখতিয়ার খলজির অভিযানের কাহিনি শুনেছিলেন। তাঁর লেখা *তবকাত-ই নাসিরি* থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খলজি এবং তাঁর তুর্কি বাহিনী ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নদিয়ায় ঢুকেছিলেন। সে সময় বাংলা থেকে উত্তর দিকে তিব্বত পর্যন্ত ঘোড়ার ব্যবসা বেশ চালু ছিল। কাজেই তুর্কিদের নদিয়ায় ঢুকতে দেখে কেউই তাদের আক্রমণকারী ভাবেনি। এই নদিয়া কোথায় ছিল?

হয়তো এই নদিয়া ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরে, যা আজ নদীর তলায় চলে গেছে। অথবা হয়তো বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নৌদা গ্রামই হলো সেকালের নদিয়া। সে যাই হোক, তুর্কি অভিযানের সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন নদিয়ায় ছিলেন।

গল্প আছে যে, বখতিয়ারের সঙ্গে মাত্র সতেরো জন সৈন্য ছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সেকালে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসার একাধিক রাস্তা

টুকরো কথা

পরবর্তী খিলাফৎ

প্রথম চারজন খলিফার পরে খলিফা পদটি কয়েকটি রাজবংশের হাতে চলে যায়। যেমন- উম্মাইয়া, আব্বাসিয়া, ফতিমিদ, অটোমান প্রভৃতি। উম্মাইয়া খিলাফৎ (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) গড়ে উঠেছিল সিরিয়ার দমাস্কাসকে কেন্দ্র করে। আব্বাসিয়া খিলাফৎ (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) -এর রাজধানী ছিল বোগদাদ। খলিফা আল হারুন-আল রসিদ আব্বাসিদের মধ্যে বিখ্যাত খলিফা। আব্বাসিয়াদের ক্ষমতা শেষ কয়েক শতকে কমে যায়। তখন মিশরে ফতিমিদ খিলাফৎ (৯০৯-১১৭১ খিস্টাব্দ) -এর শাসক ছিল। এবং ঐ সময় উম্মাইয়ারাও আবার স্পেনে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করে (৯২৯-১০৩১ খ্রিস্টাব্দ)। অটোমানরাও তাদের খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৫১৭-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই ভাবে খলিফা ও খিলাফতের ধারা চলেছিল।

ছিল। সাধারণত বিহার থেকে বাংলায় আসার সময়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তর দিকের পথ ধরেই আসা হতো। রাজা লক্ষ্মণসেনও ওই পথে তুর্কি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজি তাঁর সৈন্যদের অনেকগুলি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন।

তখন দুপুরবেলা, বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন খেতে বসেছিলেন। তুর্কিরা আসছে শুনে তিনি কোনো প্রতিরোধ না করে পূর্ববঙ্গের দিকে চলে যান।

তুর্কিরা বিনা যুদ্ধেই নদিয়া জয় করে। এরপর বখতিয়ার নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহরকে সমকালীন ঐতিহাসিকরা লখনৌতি বলে উল্লেখ করেছেন।

বখতিয়ার খলজি নিজের নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইসব শাসনকর্তারা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের আস্তানা তৈরি করে দেন।

লখনৌতি রাজ্যের সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজি অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে রাজ্যবিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি মারা যান। বাংলায় তুর্কি অভিযানের একটা অধ্যায় শেষ হয়। ঐ একই সময়ে পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু ঘটেছিল।

ছবি ২.৩ : মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা একটি ছবি

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় _____ (ঐতরেয় আরণ্যক/আইন-ই-আকবরি/অর্থশাস্ত্র) গ্রন্থে।

(খ) প্রাচীন বাংলার সীমানা তৈরি হয়েছিল _____, _____ এবং _____ (ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা/গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু/কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী) নদী দিয়ে।

(গ) সকলোত্তরপথনাথ উপাধি ছিল _____ (শশাঙ্কের/হর্ষবর্ধনের/ধর্মপালের)।

(ঘ) কৈবর্ত বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন _____ (ভীম/রামপাল/প্রথম মহীপাল)।

(ঙ) সেন রাজা _____ (বিজয়সেনের/বল্লালসেনের/লক্ষ্মণসেনের) আমলে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ঘটে।

(চ) সুলতানি যুগের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন _____ (মহম্মদ ঘুরি/মিনহাজ-ই সিরাজ/ ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি।)

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ	*খ-স্তম্ভ*
বজ্রভূমি	বৌদ্ধ বিহার
লো-টো-মো-চিহ্	আধুনিক চট্টগ্রাম
গঙ্গাইকোণ্ডচোল	বাক্‌পতিরাজ
গৌড়বহো	উত্তর রাঢ়
হরিকেল	অল বিরুনি
কিতাব অল-হিন্দ	প্রথম রাজেন্দ্র

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

(ক) এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র দেখো। তাতে আদি-মধ্য যুগের বাংলার কোন কোন নদী দেখতে পাবে?

(খ) শশাঙ্কের আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল তা ভেবে লেখো।

(গ) মাৎস্যন্যায় কী?

(ঘ) খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি কেমন ভাবে গড়ে উঠেছিল?

(ঙ) সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? কীভাবে তারা বাংলায় শাসন কায়েম করেছিলেন?

(চ) সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে লুঠ করা ধনসম্পদ কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন?

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :**

(ক) প্রাচীন বাংলার রাঢ়-সুহ্ম এবং গৌড় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় দাও।

(খ) শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক কেমন ছিল, সে বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

(গ) ত্রিশক্তি সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল?

(ঘ) ছক ২.১ ভালো করে দেখো। এর থেকে পাল ও সেন শাসনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করো।

(ঙ) দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করো। কোন কোন অঞ্চল চোল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল?

(চ) ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে আরব দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব দেশে কী বদল এনেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) মনে করো তুমি রাজা শশাঙ্কের আমলের একজন পর্যটক। তুমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছ। পথে তুমি কোন কোন অঞ্চল ও নদী দেখতে পাবে? কর্ণসুবর্ণে গিয়েই বা তুমি কী দেখবে ?

(খ) মনে করো দেশে মাৎস্যন্যায় চলছে। তুমি ও তোমার শ্রেণির বন্ধুরা দেশের রাজা নির্বাচন করতে চাও। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।

(গ) মনে করো যে তুমি কৈবর্ত নেতা দিব্য। পাল রাজাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগুলি কী কী থাকবে? কীভাবেই বা তুমি তোমার বিদ্রোহী সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করবে তা লেখো।

(ঘ) মনে করো তুমি বাংলায় তুর্কি আক্রমণের দিন দুপুরবেলায় নদিয়া শহরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলে। সেই সময় কী দেখলে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

৩.১ ভারতের অর্থনীতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে ভারতের অর্থনীতির কথা। বিশেষ করে ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারত এবং পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকেই উত্তর ভারতের বেশ কিছু জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা দেখা গিয়েছিল। নগরগুলির খারাপ অবস্থা পর্যটকদের চোখে পড়েছিল। পুরোনো বাণিজ্য-পথগুলির গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তবে নতুন বাণিজ্য পথ বা নতুন শহর গড়ে ওঠেনি তাও নয়। *সুয়ান জাং* থানেশ্বর, কনৌজ ও বারাণসীতে ব্যবসায়িক কাজকর্মের রমরমার উল্লেখ করেছেন। আবার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবেও স্থানীশ্বর এবং কনৌজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্দর নগরীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং নবম শতাব্দী থেকে আরব বণিকদের যাতায়াত বেড়ে যাওয়ায়ও বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। গ্রামীণ বাজারে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য শস্য বেচাকেনা অনেকগুণ বেড়েছিল। বিশেষত আখ, তুলো এবং নীলের হাট অনেক অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল। এসময়ে উত্তর ভারতে ভালো মানের সোনা বা রুপোর মুদ্রার অভাব ছিল। তবে সমকালীন গ্রন্থগুলিতে বহু ধরনের মুদ্রার নাম পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলি কতটা চলত, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

৩.১.১. ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা

আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলির বাড়-বাড়ন্তের ছাপ সে সময়ের ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতিতে পড়েছিল। সমাজে এক বিশেষ গোষ্ঠীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। সমকালীন লেখকরা *সামন্ত, রাজ, রৌণক*—এসব নামে ঐ গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু ছিল উঁচু রাজকর্মচারী। তাদের নগদ বেতন না দিয়ে অনেক সময়ে জমি দেওয়া হতো। সেই জমির রাজস্বই ছিল ঐ কর্মচারীদের আয়।

আবার কিছু অঞ্চলে যুদ্ধে হেরে যাওয়া রাজারাও সেই অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করত। কখনওবা যুদ্ধপটু উপজাতি নেতারা কোনো কোনো অঞ্চলে কর্তৃত্ব করত।

এই গোষ্ঠীগুলির এক জায়গায় মিল ছিল। এরা কেউই পরিশ্রম করে উৎপাদন করত না। অন্যের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বা রাজস্ব থেকে নিজেরা জীবিকা চালাত। এই অন্যের শ্রমভোগী গোষ্ঠীর মধ্যেও স্তরভাগ ছিল। কেউ ছিল একটি গ্রামের

প্রধান। কেউ বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে একটা অঞ্চলের দখল রাখত। একটি বিরাট অঞ্চলের উপরেও কর্তৃত্ব ছিল কারো কারো। এভাবেই রাজা, গোষ্ঠীর শাসক এবং জনগণকে নিয়ে একটি স্তরভেদ তৈরি হয়েছিল সমাজে। মহাসামন্ত, সামন্তদের মধ্যে সবসময়েই যুদ্ধ-ঝগড়া চলত। সবাই চাইত নিজের ক্ষমতা আরও খানিক বাড়িয়ে নিতে। কখনোবা এরা জোট বেঁধে রাজার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে নামত। একসময়ে দখল করা গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি, গ্রামের শাসন এবং বিচারও করত এই গোষ্ঠী। রাজার ক্ষমতাকেও এরা অনেক সময়ে অস্বীকার করত। এর ফলে রাজশক্তির দুর্বলতা পরিষ্কার হয়ে যায়। সামন্ত নেতাদের দাপটে গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও নষ্ট হয় (**স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আরও জানবে নবম অধ্যায়ে**)।

সেই সমাজের ছবি আঁকলে সেটি হবে এরকম :

দেখো, ত্রিভুজটি নীচের দিকে চওড়া হয়েছে। তার মানে, নীচে অনেক জনগণ, তাদের উপর বেশ কিছু সামন্ত বা মাঝারি শাসক। মাঝারি শাসকদের উপরে অল্প কিছু মহাসামন্ত। আর সবার উপরে রাজা। রাজস্ব ও শাসনের অধিকার এইভাবে স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকে 'সামন্ত ব্যবস্থা' বলে।

টুকরো কথা

ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

খ্রিস্টীয় নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপে এক রকম সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল। একে *সামন্ততন্ত্র* বলে। সামন্ত সমাজের কাঠামো ছিল ত্রিভুজের মতো। তার নানা স্তরে ছিলেন রাজা, বিভিন্ন সামন্ত এবং উপসামন্ত। সামন্তপ্রভুদের অধীন নাইটরা লোহার পোশাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। প্রত্যেক সামন্তপ্রভু বহু দুর্গ তৈরি করেন। সামন্তপ্রভুদের ম্যানর বা খামারে ভূমিদাস বা সার্ফদের খাটিয়ে উৎপাদন করা হতো। এ ছাড়া ছিলেন স্বাধীন চাষী। চাষবাস ছাড়া বাণিজ্যও হতো। গড়ে উঠেছিল নগর। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সেরা সময়। এর দেড়শো-দুশো বছর পর থেকে এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরতে থাকে। তবে, ষোড়শ শতকের ইউরোপের পূর্ব ভাগে আবার ভূমিদাস প্রথা কিছু কালের জন্য ফিরে এসেছিল।

৩.১.২ দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতের রাজশক্তিগুলি বহু মন্দির তৈরি করেছিল। সেগুলি শুধুমাত্র পুজোর জন্যই ব্যবহৃত হতো না। তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে চোল শাসক রাজরাজ এবং রাজেন্দ্রর সময়ে দুটি অসাধারণ সুন্দর মন্দির তৈরি হয়। মন্দির ঘিরে লোকালয় এবং শিল্পীদের বসবাস গড়ে উঠত। মন্দির কর্তৃপক্ষকে রাজা, ব্যবসায়ী ও অভিজাতরা নিষ্কর জমি দান করতেন। সেই জমির ফসল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের জীবনযাপনের জন্য লেগে যেত। পুরোহিত, মালাকার, রাঁধুনি, গায়ক, নর্তক-নর্তকী প্রমুখ মন্দির চত্বরে থাকত। চোল রাজ্যের ব্রোঞ্জ হস্তশিল্প খুব বিখ্যাত ছিল। তামিলনাড়ু অঞ্চলে কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলি থেকে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে, কোথাও বছরে দু-বার ফসল ফলানোও সম্ভব হয়। যেখানে সেচের সুযোগ কম ছিল, সেখানে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, বিল কাটা হতো। কোথাও কুয়োর ব্যবস্থাও ছিল।

চোল রাজ্যের প্রধান ছিলেন রাজা। তাঁকে মন্ত্রীদের এক পরিষদ সহায়তা করত। রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা *মণ্ডলমে* ভাগ করা হয়েছিল। কৃষকদের বসতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামকে শাসন করত গ্রাম-পরিষদ বা *উর*। এই রকম কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গঠিত হতো *নাড়ু*। উর এবং নাড়ু— এই দুই স্থানীয় সভা স্বায়ত্তশাসন, বিচার এবং রাজস্ব বা কর সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করত। ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মদেয় জমি দেওয়ার ফলে কাবেরী উপত্যকায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বহু নতুন নতুন গ্রামের পত্তন হয়েছিল। এই নতুন গ্রামগুলিকে তদারকি করার জন্য বয়স্ক মানুষদের নিয়ে তৈরি হতো সভা। তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার জন্য 'নগরম' নামের আরেকটি পরিষদ তৈরি হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে অবশ্য নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় যে চেট্টি বা বণিকরা পণ্য সাজিয়ে যাতায়াত করতেন। বিভিন্ন বণিক সংগঠন বা সমবায়ের কথাও জানা যায়। ঐ সংগঠনগুলি বিভিন্ন মন্দিরকে জমি দান করতেন, সেরকম বর্ণনা দক্ষিণ ভারতে তাম্রলেখগুলিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চোলদের ক্ষমতা বাড়ায় সেখানকার বাণিজ্যের উপর ভারতীয় বণিকদের প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়েছিল।

এই সময় রাজারা অনেকেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উপাধিতে নিজেদেরকে ভূষিত করতেন। যেমন *মহারাজা-অধিরাজ, ত্রিভুবন-চক্রবর্তীন* এই রকম সব। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় সামন্ত বা ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং

কর সংগ্রহ করা কাকে বলে? এখন কী কী ভাবে কর সংগ্রহ করা হয়?

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতেন। কৃষক, পশুপালক এবং কারিগরদের উৎপাদন থেকে রাজা ভাগ নিতেন। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও কর সংগ্রহ করা হতো। সেখান থেকেই রাজার বিলাসবহুল জীবন চলত। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা, দুর্গ এবং মন্দির বানানোয় সেই অর্থ খরচ করা হতো। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় বিজয়ী শক্তির সৈন্যরাও পরাজিত অঞ্চলে যথেষ্ট লুঠপাট চালাত। স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবারগুলোর হাতেই খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হতো। খাজনার একাংশ ঐ পরিবারগুলি নিজেদের জন্য রেখে, বাকি অংশ রাজকোষাগারে জমা দিত। কোনো কোনো সময় পরাজিত রাজাদের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বুঝে তাদের অধীনতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে জমি-জায়গা দান হিসাবে ফেরত দেওয়া হতো। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণদের অনেক সময় জমি দান করা হতো। তারা অনাবাদী জমি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি তৈরি করতেন। ব্রাহ্মণদের কিছু জমি দেওয়া হতো, যার কর নেওয়া হতো না। এই জমি দানের ব্যবস্থাকে ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থা বলা হতো।

রাজারা কেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করতেন বলে মনে হয়?

৩.১.৩ পাল-সেন যুগের বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি

পাল-সেন যুগে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে এই যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশই কমে এসেছিল। ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপটের ফলে বাংলার বণিকরা পিছু হটেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার যোগ ছিল। পাল-সেন যুগের বাংলায় সোনা-রুপোর মুদ্রার ব্যবহার খুব কমে যায়। কড়িই হয়ে উঠেছিল জিনিস কেনা-বেচার প্রধান মাধ্যম।

এই সময়ের কৃষিনির্ভর সমাজে ভূমিদানের অনেক নিদর্শন আছে। পাল যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজারা ভূমিদান করতেন। সেন যুগে অনেক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে। সে আমলের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে জমি কেনা-বেচার সময় কৃষককেও তার খবর দিতে হতো। সুতরাং, সমাজে কৃষককে নিতান্ত অবহেলা করা হতো না। তবে জমিতে মূল অধিকার ছিল রাষ্ট্র বা রাজার।

রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬ ভাগ) কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভোগের জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করতেন। বণিকরাও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর

ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপরেও কর দিতে হতো গ্রামবাসীদের। এছাড়া হাট এবং খেয়াঘাটের উপরে কর চাপানো হতো।

এই যুগের প্রধান ফসলগুলি ছিল ধান, সরষে এবং নানারকমের ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, নারকেল ইত্যাদি। আজকে বাঙালির খাদ্যতলিকায় ডাল একটি প্রধান উপাদান। অথচ, সে যুগের শস্যের মধ্যে ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ ছাড়া কার্পাস বা তুলো, পান, সুপুরি, এলাচ, মহুয়া ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গ্রামের আশে-পাশে ঘন বাঁশবন এবং নানারকম গাছের কথা জানা যায়। সেগুলির কাঠ ছিল এ যুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নদনদীপূর্ণ বাংলার আরেকটি বড়ো সম্পদ ছিল মাছ।

সে যুগের বাংলার প্রধান ফসলগুলির ও পশু-পাখির মধ্যে কোনগুলি আজকের পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায়?

টুকরো কথা

বাঙালির খাওয়া-দাওয়া

যে-দেশে ধানই হলো প্রধান ফসল সে-দেশে ভাতই যে মানুষের প্রধান খাদ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। গরম ভাতে গাওয়া ঘি, তার সঙ্গে মৌরলা মাছ, নালতে (পাট) শাক, সর-পড়া দুধ আর পাকা কলা দিয়ে খাবারের বর্ণনা আছে প্রাচীন কাব্যে। গরিব লোকের খাদ্যতালিকায় থাকত নানা ধরনের শাক-সবজি। আজ আমরা যে-সব সবজি খাই যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল, ডুমুর, কচু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির খাবারে জায়গা করে নিয়েছে। নদীনালার দেশে রুই, পুঁটি-মৌরলা, শোল, ইলিশ ইত্যাদি মাছ খাওয়ার অভ্যেসও ছিল। সেকালে বাঙালি সমাজের সব লোকে না খেলেও অনেকেই হরিণ, ছাগল, নানা রকমের পাখি ও কচ্ছপের মাংস, কাঁকড়া, শামুক, শুকনো মাছ ইত্যাদি খেত। অনেক পরে মধ্যযুগে পোর্তুগিজদের কাছ থেকে বাঙলার লোকেরা আলু খেতে শিখেছে। ডাল খাওয়ার অভ্যেস হয়তো বাঙালি পেয়েছে উত্তর ভারতের মানুষদের কাছ থেকে। তা ছাড়া আখের গুড়, দুধ এবং তার থেকে তৈরি দই, পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি ছিল বাঙালির প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু। আর ছিল বাংলায় উৎপন্ন লবণ। মহুয়া এবং আখ থেকে তৈরি পানীয়ও বাঙালি সমাজে চালু ছিল।

গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে ছিল গোরু, বলদ, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা, কাক, কোকিল, নানান জলচর পাখি, ঘোড়া, উট, হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, বানর, হরিণ, শূকর, সাপ ইত্যাদি। এর মধ্যে ঘোড়া এবং উট বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র ছিল প্রধান সামগ্রী। বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড়ের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠ এবং ধাতুর তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস, গয়নার কথা জানা যায়। ঘর-বাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে কাষ্ঠশিল্পীরা সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেতেন। শিল্পীরা বিভিন্ন নিগম বা গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন।

টুকরো কথা

চক্রপাণিদত্ত

চক্রপাণিদত্ত ছিলেন পালযুগের একজন নামকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। তাঁর বাড়ি ছিল সম্ভবত বীরভূম জেলায়। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক ও সুশ্রুতের রচনার ওপর তিনি টীকা লিখেছিলেন। এ ছাড়া, ভেষজ গাছ-গাছড়া, ওষুধের উপাদান, পথ্য নিয়েও তিনি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা সেরা বই হলো চিকিৎসা-সংগ্রহ।

৩.২ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

পালযুগ বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময়কাল। আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার গৌড়-বঙ্গীয় রূপ থেকে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। সেটাই ছিল সাধারণ, নিরক্ষর লোকের ভাষা।

সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র তখনও প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হত। ঐ ভাষা শিক্ষিত, পণ্ডিত এবং সমাজের উঁচু তলার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্য বা চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইগুলো সংস্কৃত ভাষাতে লেখা।

টুকরো কথা

রামচরিত

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ রামপালের ছেলে মদনপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১১৪৩-'৬১খ্রিঃ) রামচরিত কাব্য লিখেছিলেন।

রামচরিতের কাহিনি রামায়ণের গল্প অনুসারে লেখা হয়েছে। এতে কবি একই কথার দু-রকম মানে করেছেন। তিনি একদিকে রামায়ণের রাম এবং অন্যদিকে পালরাজা রামপালের কথা লিখেছেন।

রামায়ণের আদলে লেখা হলেও এই কাব্য শুধুই বাল্মীকি-রামায়ণের পুনরাবৃত্তি নয়। এই কাব্যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বাংলার প্রেক্ষাপটে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। রামায়ণের ভূগোল আর রামচরিতের ভৌগোলিক বিবরণ এক নয়। রামায়ণের অযোধ্যার বদলে এখানে রামপালের রাজধানী রামাবতীর কথা বলা হয়েছে। রামায়ণের সীতা উদ্ধারের কাহিনির সঙ্গে রামপালের বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণে সীতার খোঁজে রামের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে। এর সঙ্গে তুলনা করে রামচরিতে বলা হয়েছে যে, রামপাল তাঁর রাজ্যে সামন্তদের সমর্থন জোগাড় করার জন্য নানা জায়গায় ঘুরছেন। ঐ সামন্তদের সাহায্যেই রামপাল কৈবর্তদের হাত থেকে তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ, সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণের সীতা এবং পাল শাসকের আমলের বরেন্দ্রভূমিকে এক করে দিয়েছেন। সীতার

রূপবর্ণনার মাধ্যমে বরেন্দ্রভূমি এবং চারপাশের এলাকার নদনদী, ফুলফল, গাছপালা, ফসল, বর্ষাকাল ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে রাম এবং রামপালের গল্প লিখতে গিয়ে রামচরিতের ভাষা জটিল হয়ে পড়েছে। এর ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই কাব্য পণ্ডিত ও শিক্ষিত মানুষদের জন্যই লেখা হয়েছিল সাধারণ মানুষের এই কাব্য পড়ার সামর্থ্য ছিল না।

পাল রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সম্ভবত ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তবে শশাঙ্কের আমলের বৌদ্ধধর্মের থেকে পালযুগের বৌদ্ধধর্ম অনেকটা আলাদা ছিল। পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা মিলে গিয়ে বজ্রযান বা তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের জন্ম হয়েছিল। এই মতের নেতাদের বলা হতো সিদ্ধাচার্য। এছাড়া সহজযান ও কালচক্রযান নামে আরো দু-রকমের বৌদ্ধ ধর্মমতের এ সময় জন্ম হয়। সহজযানকে সহজিয়াও বলা হয়।

এই ধর্মীয় ভাবনায় না ছিলো দেবদেবীর স্বীকৃতি, না মন্ত্র-পুজো-আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব। এই মতে বিশ্বাসীরা গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে গভীর যোগাযোগে বিশ্বাস করত। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্ঞান মানুষের ভিতরেই থাকে এবং কোনো শাস্ত্রের বই পড়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিষ্কার মন এবং আত্মার উপর খুব জোর দেওয়া হতো। তাঁরা বলতেন যে, আত্মা শুদ্ধ হলে তবেই মানুষ নির্বাণ বা চিরমুক্তি লাভ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির বাইরে এই মতবাদগুলিতে উদার ধর্মীয় পথের খোঁজ পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া সিদ্ধাচার্যরা যেমন লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ প্রমুখ তাদের মত প্রচার করতেন স্থানীয় ভাষায়। পালযুগের শেষ দিক থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই ভাষায় *চর্যাপদ* লেখা শুরু করেছিলেন। চর্যাপদের মধ্য দিয়ে তখনকার বাংলার পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। এভাবে তাদের হাত ধরেই আদি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল।

টুকরো কথা

চর্যাপদ

চর্যাপদ হলো খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে লেখা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কবিতা ও গানের সংকলন। চর্যাপদে যে ভাষা রয়েছে তা হলো আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই চর্যাপদ-এর পুঁথি উদ্ধার করেন।

টুকরো কথা

নির্বাণ

বৌদ্ধ ধর্মমতে নির্বাণ (মুক্তি) লাভ করলে বারবার মানুষকে জন্মাতে হয় না।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) সমসাময়িক লেখক অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ বা মুক্তি বলতে কী বোঝানো হয় তা খুব সুন্দর একটা উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন তার শিখা নিভে যায়, জীবনে ক্লেশ বা দুঃখের অবসান হলে চিরতরে মুক্তি বা নির্বাণ মেলে। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্মের হীনযান শাখার।

মহাযানীদের ধারণা ছিলো যে নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো কিছুই নেই। পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধারণাগুলোতে অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী ছিল। তারা নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিত।

পাল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা এবং বিহারে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। পাল যুগের বাংলায় শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রাহ্মণদের থেকে বৌদ্ধ প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা বহু বই আজ হারিয়ে গেছে। তবে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদের কিছু-কিছু অস্তিত্ব জানা গেছে।

বৌদ্ধ বিহারগুলির মতো পড়াশোনার কেন্দ্র কি আজকাল দেখা যায়?

বৌদ্ধ দার্শনিকদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল আজকের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধবিহারগুলি। নালন্দা, ওদন্তপুরী (নালন্দার কাছে), বিক্রমশীল (ভাগলপুরের কাছে), সোমপুরী (রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে), জগদ্দল (উত্তরবঙ্গে), বিক্রমপুরী (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি বিহারগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। পালরাজাদের সমর্থনে ও বৌদ্ধ আচার্য এবং ছাত্রদের উৎসাহে এই বিহারগুলিসেকালের শিক্ষা-দীক্ষায় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। আচার্য ও ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালি। আচার্যদের মধ্যে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, কম্বলপাদ ও শবরীপাদ এবং দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ), গোরক্ষনাথ ও কাহ্নপাদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

টুকরো কথা

নালন্দা

সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটদের আমলে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আজকের বিহার রাজ্যে ***নালন্দা বৌদ্ধবিহার*** *তৈরি হয়েছিল। কালে কালে সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার শিক্ষা-দীক্ষার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হর্ষবর্ধন এবং পাল রাজাদের আমলে নালন্দা শাসকদের সাহায্য পেয়েছিল। স্থানীয় রাজা এবং জমির মালিকরা তো বটেই, এমনকী সুদূর সুমাত্রা দ্বীপের শাসকও এই মহাবিহারের জন্য সম্পদ দান করেছেন। তা থেকে ছাত্রদের বিনা পয়সায় খাবার, জামাকাপড়, শয্যাদ্রব্য এবং ওষুধপত্র দেওয়া হতো। সুদূর তিব্বত, চিন, কোরিয়া এবং মোঙ্গলিয়া থেকে ছাত্ররা এখানে আসত পড়াশোনার জন্য। তার মধ্যে চিনদেশের ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ তহবিলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে এই বিহারে শিক্ষালাভ করেছেন। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্ররা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। নালন্দার সমৃদ্ধির যুগে দশ হাজার জন আবাসিক ভিক্ষু এখানে থাকত। তার মধ্যে ১,৫০০ জন ছিল শিক্ষক এবং ৮,৫০০ জন ছিল ছাত্র। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এর খ্যাতি বজায় ছিল। ঐ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা বিহার অঞ্চল আক্রমণ করে এই মহাবিহারের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।*

ছবি ৩.১ : নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিহার

ছবি ৩.২ : বিক্রমশীল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিহার

তোমার খাতায় একটা শঙ্কু আকৃতির বৌদ্ধ স্তূপের ছবি আঁকো।

টুকরো কথা

বিক্রমশীল

পাল সম্রাট ধর্মপাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে মগধের উত্তর ভাগে গঙ্গার তীরে আধুনিক ভাগলপুর শহরের কাছে ***বিক্রমশীল মহাবিহার*** *প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী পাঁচশো বছর এটি টিকে ছিল। এই মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা এবং শিক্ষার জন্য একশোর বেশি আচার্য ছিলেন। সেখানে পড়াশোনার জন্য ছাত্ররা আসত। এখানে ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হতো। সর্বোচ্চ তিন হাজার ছাত্র এখানে পড়ত এবং বিনা খরচে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ভর্তি হতে হতো। শিক্ষা শেষে তাদের উপাধি প্রদান করা হতো। বিক্রমশীল ছিল বজ্রযান বৌদ্ধ মতচর্চার একটা বড়ো কেন্দ্র। এর গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) ছিলেন এই মহাবিহারের অন্যতম একজন মহাচার্য। এই মহাবিহারকেও ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা ধ্বংস করেছিল।*

পালযুগের শিল্পরীতিকে প্রাচ্য শিল্পরীতি বলা হয়। এই রীতির পূর্বসূরি ছিল গুপ্তযুগের শিল্পকলা। পাল আমলের স্থাপত্যের মধ্যে ছিল স্তূপ, বিহার এবং মন্দির। তবে প্রকৃতির কোপে এবং মানুষের রোষে সেই স্থাপত্যের আর বিশেষ কিছু নেই।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈনদের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের রীতি ছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধরা বহু স্তূপ তৈরি করেছিল। এগুলি প্রথমে দেখতে ছিল গোলাকার, পরে অনেকটা মোচার খোলার মতো শঙ্কু আকৃতির হয়ে পড়ে।

পাল রাজত্বে তৈরি স্তূপগুলো শিখরের মতো দেখতে ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আসরফপুর গ্রামে, রাজশাহীর পাহাড়পুরে, চট্টগ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ভরতপুর গ্রামে বৌদ্ধ স্তূপ পাওয়া গেছে। তবে স্তূপ নির্মাণে বাংলায় কোনো মৌলিক ভাবনার বিকাশ লক্ষ করা যায়নি। বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহার ছিল পাল আমলের উল্লেখযোগ্য বিহার। মন্দিরের মধ্যে সোমপুরী বিহারের মন্দির ছিল উল্লেখযোগ্য বিহার। চারকোণা এই মন্দিরে গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ পথ, মণ্ডপ, সুউচ্চ স্তম্ভ ইত্যাদি ছিল। মন্দির নির্মাণে স্থানীয় পোড়ামাটির ইট এবং কাদার গাঁথুনি ব্যবহার করা হয়েছিল।

ছবি ৩.৩ : বাংলার মূর্তি (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)। [(ক) সূর্য (খ্রিঃ ৭ম–৮ম শতক)] [(খ) মঞ্জুবজ্র মণ্ডল (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(গ) চণ্ডী (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(ঘ) মহিষাসুরমর্দিনী (খ্রিঃ ১২শ শতক)] [(ঙ) উমা–মহেশ্বর (খ্রিঃ ১২শ শতক)]

পাল আমলের ভাস্কর্যগুলি ঐ আমলের শিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাহাড়পুর প্রত্নক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো নির্দশন পাওয়া যায়। এখানে মূল মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলক রয়েছে যার মধ্যে স্থানীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট। ফলকগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম, শিব, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। এই দেব-দেবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি। পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি উভয়ের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। ভাস্কর্যের মধ্যে পোড়ামাটির শিল্পসামগ্রীও ছিল। এগুলি ছিল স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতীক। এগুলিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, সমাজজীবন, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি ফুটে উঠেছে।

খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে আঁকা কোনো ছবি আজ আর পাওয়া যায় না। যে ছবিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলো বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপি অলংকরণ করার জন্য আঁকা হয়েছিল। এই ছবিগুলি আকারে ছোটো কিন্তু এগুলি পরের যুগের অণুচিত্রের (মিনিয়েচার) মতো সূক্ষ্ম রেখাময় নয়। বরং এগুলির সঙ্গে প্রাচীরগাত্রে আঁকা ছবির মিল আছে।

ছবি ৩.৪ :
পালযুগে লেখা অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুথির একটি পাতার আঁকা ছবি

পাল যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বরেন্দ্রভূমির ধীমান এবং তাঁর ছেলে বীটপাল ছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী। তাঁরা ধাতব শিল্পে, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

সেন রাজাদের আমলে স্থানীয় গ্রাম শাসনব্যবস্থায় অবনতি ঘটেছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ শিথিল হয়ে এসেছিল। রাষ্ট্র অসংখ্য ছোটো-ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেন আমলের লেখগুলোতে রাজ্ঞী বা রাজমহিষীদের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, রাজপরিবারের মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছিল।

সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল মোটামুটি সচ্ছল। তবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এর প্রমাণ আছে সে যুগের সাহিত্যে। পাল আমলের তুলনায় সেন আমলে বর্ণব্যবস্থা কঠোর, অনমনীয় হয়ে পড়েছিল।

পাল যুগের মতো সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটেনি। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এই দুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য, বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা, মাতৃকা, শিব, বিষ্ণুর পুজো করা হতো। সেন রাজাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণব, তবে তার পূর্বসূরিরা ছিলেন শৈব।

বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও বৌদ্ধরা আগেকার যুগের মতো সুযোগ-সুবিধা পেত না। ব্রাহ্মণরাই সমাজপতি হিসাবে সুবিধা ভোগ করত। আবার, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ ছিল। অ-ব্রাহ্মণদের সবাইকে 'সংকর' বা 'শূদ্র' হিসাবে ধরা হতো। ব্রাহ্মণরা অ-ব্রাহ্মণদের কাজ করতে পারত, কিন্তু অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের কাজগুলি করতে পারত না। এ ছাড়া, সেন আমলে আদিবাসী-উপজাতি মানুষদের কথাও জানা যায়।

সেন যুগে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের বিষয় ছিলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনি। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার আর এক কবি ধোয়ী লিখেছিলেন *পবনদূত* কাব্য। এ যুগের আরো তিনজন কবি ছিলেন গোবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ। এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে।

সেন যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মী কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে সাহিত্যেরও যোগ ছিল। রাজা বল্লালসেন এবং রাজা লক্ষ্মণসেন দুজনেই স্মৃতিশাস্ত্র লিখেছিলেন। বল্লালসেনের লেখা চারটে বইয়ের মধ্যে *দানসাগর* এবং *অদ্ভুতসাগর* বই দুটি পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ বৈদিক নিয়ম বিষয়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামে একটা বই লিখেছিলেন। অভিধানপ্রণেতা সর্বানন্দ এবং গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ শ্রীনিবাস ছিলেন সেন যুগের আরো দুজন লেখক।

টুকরো কথা

সাহিত্য ও সমাজ

সাহিত্য হলো সমাজের আয়না। একদিকে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্যে ধনী ও বিলাসী জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল। রাজা লক্ষ্মণসেনকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে কবিরা স্তুতি করেছেন। আবার, গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের জীবনযাত্রার ছবি ফুটেছে এই রকম একটি রচনায় : বর্ষার জল পেয়ে চমৎকার ধান গজিয়েছে, গোরুগুলো ঘরে ফিরে এসেছে, খেতে ভালো আখ হয়েছে, আর কোনো ভাবনা নেই।

অন্যদিকে, গরিব মানুষের জীবনেরও ছায়া পড়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। খিদেয় কাতর শিশু, গরিব লোকের ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাপড় এই সব দৃশ্য ব্যবহার করেছেন কবিরা। বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের বাসিন্দা গরিব মানুষের জীবনের কষ্ট ধরা পড়েছে এই রকম একটি লেখায় : কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচো খুঁজতে আসা ব্যাঙে আমার ভাঙা ঘর ভরে গেছে। চর্যাপদের একটি কবিতায় আছে— 'হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস'। এটাই চরম দারিদ্র্যের নিদর্শন।

টুকরো কথা

ডাক ও খনার বচন

প্রাচীন বাংলার সমাজে কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ডাক ও খনার বচন-এর ছড়াগুলো তারই প্রমাণ। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই বচন বা ছড়াগুলি চলত। কোন ঋতুতে কী ফসল বুনতে হবে, কোন ফসলের জন্য কেমন মাটি দরকার, কতটা বৃষ্টির দরকার— এসব নানা কিছুর হদিস এই ছড়াগুলিতে আছে। যেমন :

ক) মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল।

খ) খনা ডেকে ব'লে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান।

গ) খনা বলে চাষার পো (ছেলে)। শরতের শেষে সরিষা রো।

ঘ) দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল।

ঙ) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি।

এমন আরো অনেক বচন আছে। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় এগুলো লেখা। তারা এই ছড়াগুলো থেকেই নানা দরকারি জ্ঞান পেত।

এবারে বাংলায় পাল এবং সেন শাসনকালের সংক্ষেপে তুলনা করা যেতে পারে। চারশো বছরেরও বেশি স্থায়ী পাল শাসন বাংলার সমাজে যেভাবে শেকড় গেড়েছিল, একশো বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী সেন শাসন তা পারেনি। গোপাল যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তাঁর পিছনে জনসমর্থন ছিল। বিজয়সেন এমন কোনো জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেননি। পাল শাসকরা যেভাবে বাংলার সমাজে নিজেদের শাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন, সেন শাসকরা তা পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্মচর্চায়, শিল্পকলায় পাল যুগ অনেক এগিয়ে ছিল।

ছবি ৩.৫ :
পালযুগের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি অবলম্বনে আঁকা ছবি

সেন যুগের সাহিত্য থেকে সেই সময়ের বাংলার যে দুরকম ছবি পাওয়া গেছে, এর থেকে সেযুগের সমাজ কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩.৩ ভারত ও বহির্বিশ্ব : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির লেনদেন এবং সংঘাত দেখা যায়। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নমুনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, তিব্বত এবং চিন প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। বোঝা যায় নানারকম সংস্কৃতির মেলামেশায় ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন গড়ে উঠেছিল। সেই জীবনযাপন স্থির ছিল না, প্রয়োজনে নিজেকে বদল করেছিল। ফলে আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান বৈচিত্র্যময় স্থানীয় মানুষদের দেখতে পাবে। এই বৈচিত্র্যগুলি ভালোভাবে বুঝে সেগুলি টিকিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ইসলামীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আসার ফলে ভারতের জ্ঞানচর্চার লাভ হয়েছিল বেশি। দুই সংস্কৃতির মেলামেশার ছাপ পড়েছিল সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি থেকে প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। এই বোঝাপড়া একমুখী ছিল না। উভয় উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। কখনো কখনো সংঘাতও বেঁধেছিল। তবে অনেকদিনের মেলামেশায় আস্তে আস্তে মিশে যায় দুটি ধারাই।

ছবি ৩.৬ : তিব্বতের একটি বৌদ্ধ গুম্ফায় আঁকা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)-এর প্রতিকৃতি (আনুমানিক ১১০০খ্রিঃ)। বাঁহাতে একটি তালপাতার পুঁথি ধরে অতীশ তাঁর ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

টুকরো কথা

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)

ভারত এবং বহির্ভারতের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অন্যতম উদাহরণ হলেন দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। বাঙালি বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অতীশের (আনুমানিক ৯৮০-১০৫৩ খ্রিঃ) জন্ম বঙ্গাল অঞ্চলের বিক্রমণিপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তিনি ব্রাহ্মণ্য মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তাঁর বাড়ি আজও 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিত। ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। তিনি সম্ভবত বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী এবং সোমপুরী মহাবিহারের আচার্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভের

অনুরোধে তিনি দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যান (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ)। সেখানে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁরই চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর মূল সংস্কৃত লেখাগুলি না পাওয়া গেলেও তিব্বতি ভাষায় অনুবাদগুলি পাওয়া যায়। অতীশ তিব্বতে বুদ্ধের অবতার হিসাবে পূজিত হন। তিব্বতের রাজধানী লাসার কাছে তাঁর সমাধিস্থান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সমগ্র বাংলা-বিহারের ওপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। তাই এদেশের বৌদ্ধ আচার্যরা মনে করেছিলেন যে তিনি তিব্বতে চলে গেলে ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অনেক পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই অসীম প্রতিভাধর আচার্য সম্পর্কে লিখেছেন 'বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর, জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর'।

এই সময়ে ভারতীয় শিল্প, ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় রামায়ণের ঘটনাবলি নিয়ে নৃত্য-সংগীত খুবই জনপ্রিয় ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার বোরোবোদুরের বৌদ্ধ মন্দির সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটে বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির তৈরি হয়। পরে এখানে বৌদ্ধরাও উপাসনা করত। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন গল্প গাথা খোদাই করা হয়েছে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক একমুখী ছিল, সেটা ভাবা উচিত নয়। পানপাতা ও অন্যান্য বেশ কিছু ফসল কীভাবে ফলাতে হয় তা এইসব প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে ভারত শিখেছিল। এই সব দেশগুলির শিল্প, ধর্ম, লিপি এবং ভাষার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক প্রভাব ছিল। কিন্তু সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতি তার নিজস্ব মেজাজ বজায় রেখেছিল। তার মধ্যে স্থানীয় উপাদানের সাথে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ছোঁয়াও লেগেছিল।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

(ক) নাড়ু, চোল, উর, নগরম।

(খ) ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, নালন্দা, জগদ্দল, লখনৌতি।

(গ) জয়দেব, ধীমান, বীটপাল, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণিদত্ত।

(ঘ) লুইপাদ, অশ্বঘোষ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) বিবৃতি : বাংলার অর্থনীতি পাল-সেন যুগে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : পাল-সেন যুগে বাংলার মাটি আগের যুগের থেকে বেশি উর্বর হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-২ : পাল-সেন যুগে ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : পাল-সেন যুগে রাজারা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের উপর কর নিতেন।

(খ) বিবৃতি : দক্ষিণ ভারতে মন্দির ঘিরে লোকালয় ও বসবাস তৈরি হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : রাজা ও অভিজাতরা মন্দিরকে নিষ্কর জমি দান করতেন।

ব্যাখ্যা-২ : নদী থেকে খাল কেটে সেচব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : দক্ষিণ ভারতে রাজারা অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন।

(গ) বিবৃতি : সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার কমে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : সেন রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন।

ব্যাখ্যা-৩ : সমাজে শূদ্রদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি কেন ঘটেছিল?

(খ) পাল ও সেন যুগে বাংলায় কী কী ফসল উৎপন্ন হতো? সেই ফসলগুলির কোন কোনটি এখনও চাষ করা হয়?

(গ) রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সাহিত্যচর্চার পরিচয় দাও।

(ঘ) পাল শাসনের তুলনায় সেন শাসন কেন বাংলায় কম দিন স্থায়ী হয়েছিল?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

(ক) ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার ছবি আঁকতে গেলে কেন তা একখানা ত্রিভুজের মতো দেখায়? এই ব্যবস্থায় সামন্তরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত?

(খ) পাল ও সেন যুগের বাংলার বাণিজ্য ও কৃষির মধ্যে তুলনা করো।

(গ) পাল আমলের বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো।

(ঘ) পাল ও সেন যুগে সমাজ ও ধর্মের পরিচয় দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি খ্রিস্টীয় দশম শতকের বাংলার একজন কৃষক হও, তাহলে তোমার সারাদিন কেমন ভাবে কাটবে তা লেখো।

(খ) মনে করো তুমি বিক্রমশীল মহাবিহারের একজন ছাত্র। তোমার শিক্ষক দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বতে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তুমি কী কথা বলবে? তিনিই বা তোমাকে কী বলবেন? এই নিয়ে একটি কাল্পনিক কথোপকথন লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

দিল্লি সুলতানি

তুর্কো-আফগান শাসন

৪.১ সুলতান কে?

মহম্মদ ঘুরি মারা গেলে (১২০৬ খ্রিঃ) তাঁর জয় করা অঞ্চলগুলি ভাগ হয়ে যায় তার চারজন অনুচরের মধ্যে। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পেলেন গজনির অধিকার। নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান ও উছ্-এর শাসক হয়ে বসলেন। বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশের শাসক হন। আর লাহোর ও দিল্লির অধিকার থাকে কুতুবউদ্দিন আইবকের হাতে।

দিল্লিকে কেন্দ্র করে আইবক সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। *সুলতান* একটা উপাধি। তুর্কি শাসকরা অনেকেই ঐ উপাধি ব্যবহার করতেন। আদতে আরবি ভাষায় সুলতান শব্দের মানে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এইসব। যে অঞ্চলের মধ্যে সুলতানের কর্তৃত্ব চলত, তাকে বলা হয় *সুলতানৎ* বা সুলতানি। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে সুলতানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল। তাই তার নাম দিল্লি সুলতানি বা *সুলতানৎ*।

৪.২ খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর থেকে ইসলামীয় জগতে প্রধান শাসক ছিলেন খলিফা। ইসলামের আওতায় যত অঞ্চল ছিল, তার মূল শাসক তিনিই। খলিফা আবার ধর্মগুরুও বটে। (এ বিষয়ে তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০নং পৃষ্ঠাতে পড়েছো) ফলে, দিল্লির সুলতানির উপরেও আদতে খলিফারই অধিকার ছিল।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল বিশাল অঞ্চলে। একজন খলিফার পক্ষে সমস্ত অঞ্চলে শাসন করা সম্ভবই ছিল না। তাই খলিফার থেকে অনুমোদন নিয়ে নানান অঞ্চলে নানান ব্যক্তি শাসন করতেন। তেমনই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানে শাসক ছিলেন সুলতান। কিন্তু, এমনিতে সুলতানরা খলিফাকে যে খুব মেনে চলতেন, তা নয়। তবে মাঝেমধ্যেই কে সুলতান হবেন, এই নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে উঠত। ধরা যাক, কোনো তুর্কি সেনাপতি অনেক অঞ্চল জয় করেছেন। সেই অঞ্চলটি তিনি নিজেই শাসন করতে চান। তখন ঐ সেনাপতি খলিফার কাছে উপহার পাঠিয়ে সুলতান হওয়ার আরজি জানাতেন। তার মানে খলিফার অনুমোদনের অত্যন্ত সম্মান ছিল। সেই অনুমোদনকে বাকিরা নাকচ করতে পারত না। তেমনই একটি গোলমাল

টুকরো কথা

শাসকের উপাধি

রাজা, সম্রাট, সুলতান এইসব শব্দগুলিই শাসকের উপাধি। শাসকের ধর্ম ও দেশ এবং শাসনের ক্ষমতার হেরফেরে উপাধিগুলির ব্যবহার বদলে যেত। যেমন, রাজা হলেন রাজ্যের শাসক। রাজা কথাটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। তাই ভারতবর্ষে অ-মুসলমান শাসকদের রাজা বলা হতো। আবার যে রাজা অনেক রাজ্য জয় করে বিরাট অঞ্চলের শাসক হয়েছেন, তিনি সম্রাট। সাম্রাজ্যের শাসক তিনি। সাম্রাজ্য একটি বিরাট অঞ্চল। তার সব দেখভাল সম্রাটের দায়িত্ব। একটি সাম্রাজ্যের ভেতরে রাজ্য থাকতেও পারে। রাজা সম্রাটের চেয়ে সম্মান ও ক্ষমতায় ছোটো।

সুলতানরা ছিলেন তুর্কি। সেজন্যই রাজা বা সম্রাট উপাধি না নিয়ে, সুলতান উপাধি নিলেন। তাই কুতুবউদ্দিন আইবককে সুলতান বলা হয়।

পাকিয়ে উঠল দিল্লির সুলতানিতেও। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনির শাসক হিসাবে দিল্লির উপরেও অধিকার কায়েম করতে চাইলেন। কুতুবউদ্দিন তাতে রাজি হলেন না। গজনির সঙ্গে দিল্লির সব সম্পর্ক বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, কুতুবউদ্দিনের জামাই ইলতুৎমিশ যখন সুলতান হলেন **(৪.৩ একক দেখো)**, তখনই গোলমাল জটিল হয়ে উঠল। একে তো ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দিনের জামাই, ছেলে নন। তার উপরে, নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান থেকে এসে লাহোর ও পাঞ্জাবের খানিক অংশ দখল করে নিলেন। অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষমতাবান তুর্কিরা (*আমির* বলা হতো এদের) কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। ফলে ইলতুৎমিশ পড়লেন বিপদে। কেউই তাঁকে দিল্লির সুলতান বলে মানতে চায় না। তারা তার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তখন ইলতুৎমিশ দিল্লির সুলতানিতে নিজের অধিকার বজায় রাখতে খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। খলিফার কাছে নানান উপহার পাঠান। তার বদলে বাগদাদের খলিফা ইলতুৎমিশকে *দুরবাশ* ও *খিলাত* পাঠান, এবং দিল্লির সুলতানিতে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্বকে অনুমোদন দেন।

টুকরো কথা

খলিফার অনুমোদন

ইলতুৎমিশ খলিফার থেকে অনুমোদন পান ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে। সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় নিজেদের 'খলিফার প্রতিনিধি' বলে খোদাই করাতেন। প্রতি শুক্রবারে নামাজে খলিফার নাম বলতেন। মহম্মদ বিন তুঘলক প্রথমে তাঁর আমলের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করা বন্ধ করে দেন। তবে পরে ঘন ঘন বিদ্রোহে জেরবার হয়ে তিনি আবার নিজের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করার আদেশ দেন। খলিফার থেকে অনুমোদন পত্রও আনিয়ে নেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকও দু-বার খলিফার অনুমোদন পান। এরপর থেকে অবশ্য ভারতে খলিফার থেকে অনুমোদন চাওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। আর মুঘল বাদশাহরা ভারতের বাইরের কাউকে মর্যাদা ও ক্ষমতায় নিজেদের সমান বলে মনেই করতেন না।

এভাবে যখনই শাসন ও অধিকারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত, তখনই দিল্লির সুলতানরা খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে তার অনুমোদন চাইতেন। তবে, কাজের দিক থেকে দিল্লির সুলতানরা প্রায় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। খলিফারা কেউই দূর হিন্দুস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতেন না। এভাবেই দিল্লির সুলতানি নিজের মতো করে ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্তানে প্রায় তিনশো কুড়ি বছর শাসন জারি রাখতে পেরেছিল।

টুকরো কথা

খুতবা

খুতবা কথাটির আসল মানে হল ভাষণ। কোনো সুলতানের শাসনকালে মসজিদের ইমাম একটি ভাষণ পড়তেন। শুক্রবারের দুপুরের নামাজের (জোহরের নামাজ) পরে সবার সামনে ঐ ভাষণ বা খুতবাটি পাঠ করা হতো। তাতে সমকালীন খলিফা ও সুলতানের নামের উল্লেখ থাকত। এর মধ্যে দিয়ে সুলতান যে নিয়ম মেনে শাসক হয়েছেন সেটা বারবার জানান দেওয়া হতো।

কথার মানে

আমির : *উঁচু বংশে জন্ম, বড়োলোক ব্যক্তি। তবে দিল্লির সুলতানির ইতিহাসে শাসনকাজে নিযুক্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমির বলা হতো। আমির শব্দেরই বহুবচন হলো ওমরাহ (আমিরগণ)।*

দুরবাশ : *স্বাধীন শাসনের প্রতীক দণ্ড।*

খিলাত : *আনুষ্ঠানিক পোশাক।*

৪.৩ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ

কুতুবউদ্দিন আইবকের (১২০৬-'১০ খ্রিঃ) সময়ে দিল্লিতে তুর্কি শাসন স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। মামেলুক (দাস বংশ) সুলতানরা ছিলেন ইলবারি তুর্কি। ইলতুৎমিশের (১২১১-'৩৬ খ্রিঃ) সময়ে দিল্লি সুলতানির সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, কীভাবে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহী শক্তিকে দমন করা যাবে? দ্বিতীয়ত, কীভাবে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল শক্তিকে মোকাবিলা করা যাবে? এবং তৃতীয়ত, কীভাবে সুলতানিতে একটি রাজবংশ তৈরি করা যাবে, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী গোলমাল ছাড়াই সিংহাসনে বসতে পারে? ইলতুৎমিশ ক্রমাগত যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি কৌশল করে মোঙ্গলদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করার সম্ভাবনা এড়িয়ে যান **(৪.৭.১ একক দেখো)**। এ ছাড়া তিনি একটি রাজবংশ তৈরি করে যেতে পেরেছিলেন। দিল্লির জনসাধারণের মনে তিনি বংশগত শাসনের একটি ধারণা তৈরি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বংশের শাসকরা তাঁর মৃত্যুর পরেও তিরিশ বছর শাসন করেছিল।

ইলতুৎমিশের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। তাঁর শাসনকাল (১২৩৬-'৪০ খ্রিঃ) দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে দু-ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। প্রথমত, এই প্রথম ও শেষবার একজন নারী দিল্লির মসনদে বসেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সুলতান ও তুর্কি অভিজাত অর্থাৎ *চিহলগানি*-র সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করেছিল।

ইলতুৎমিশের সন্তানদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন যোগ্যতম। একজন নারীর সিংহাসনে বসা নিয়ে অভিজাতদের এক অংশ আপত্তি করেছিল। ইলতুৎমিশের এক ছেলে অল্প দিনের জন্য শাসক হলেও শেষ পর্যন্ত রাজিয়াই ইলতুৎমিশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন।

রাজিয়া সিংহাসনে বসেছিলেন সেনাবাহিনী, অভিজাতদের একাংশ ও দিল্লির সাধারণ লোকেদের সমর্থন নিয়ে। উলেমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া অ-মুসলিমদের ওপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নিয়েছিলেন।

অন্য দিকে, তুর্কি অভিজাতরা মনে করেছিল যে রাজিয়া অ-তুর্কি অভিজাতদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর ফলে দিল্লির বাইরে যেসব তুর্কি অভিজাতরা ছিল তারা গোড়া থেকেই রাজিয়ার বিরোধিতা করতে শুরু করে।

দেশের শাসন চালিয়েছেন এমন আরো কয়েকজন নারী-শাসকের নাম খুঁজে দেখোতো। দরকারে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

টুকরো কথা

সুলতান রাজিয়া

রাজিয়া একজন নারী হলেও তাঁর উপাধি সুলতান, সুলতানা নয়। আরবি ভাষায় সুলতানা শব্দের অর্থ হলো সুলতানের স্ত্রী। কিন্তু, রাজিয়া কোনো সুলতানের স্ত্রী ছিলেন না। রাজিয়া তাঁর মুদ্রায় নিজেকে সুলতান বলে দাবি করেছেন। ওই যুগের একজন ঐতিহাসিক মিনহাজ - ই সিরাজ রাজিয়াকে সুলতান বলেই উল্লেখ করেছেন।

মানচিত্র ৪.১ :

দিল্লি সুলতানি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

এ ছাড়া রাজপুত শক্তিও তাঁর শাসনের বিরোধী ছিল। রাজিয়া কিছু বিদ্রোহ দমন করলেও মাত্র সাড়ে তিন বছরের বেশি তাঁর শাসন টেকেনি।

৪.৪ সুলতানির বিস্তার ও স্থায়িত্ব দান : গিয়াসউদ্দিন বলবন

১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান রাজিয়ার মৃত্যু হয়। এরপর কয়েক বছর দিল্লির তুর্কি অভিজাতদের সঙ্গে সুলতান ইলতুৎমিশের বংশধরদের ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছিল। ইলতুৎমিশের ছেলে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১২৪৬-'৬৬খ্রিঃ) একজন তুর্কি আমির ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নাম গিয়াসউদ্দিন বলবন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই সুলতান হন। ইলতুৎমিশের বংশের শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। এরপর থেকে বলবন ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা আরো প্রায় সাড়ে তিন দশক শাসন করেছিলেন।

টুকরো কথা

তুর্কান-ই চিহলগানি বা বন্দেগান-ই চিহলগানি

তুর্কান-ই চিহলগানি কথার আক্ষরিক মানে হলো চল্লিশ জন তুর্কি বা চল্লিশটি তুর্কি পরিবার। এরা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল।

বন্দেগান-ই চিহলগানি কথার মানে হলো চল্লিশ জন বান্দা। বান্দা মানে সেবক বা অনুগামী। এই দুটি কথা দিয়েই ইলতুৎমিশের অনুগত যোদ্ধাদের বোঝানো হতো। নামে তুর্কি হলেও এদের সবাই জাতিগতভাবে তুর্কি ছিল না। সংখ্যার দিক থেকেও তারা চল্লিশ জনের অনেক বেশি ছিল। এরাই ছিল ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ। এদের মধ্যে থেকেই গিয়াসউদ্দিন বলবন পরে সুলতান হয়েছিলেন।

বলবন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ের দিল্লি সুলতানির প্রধান সমস্যা ছিল ভিতরের বিদ্রোহ। বলবন কঠোর হাতে সেগুলিকে দমন করেছিলেন। রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি দরবারে সিজদা ও পাইবস প্রথা চালু করেছিলেন। অভিজাতদের থেকে সুলতানের ক্ষমতা যে বেশি তা বোঝানোর জন্য প্রথাগুলি চালু করা হয়েছিল।

দিল্লি সুলতানিতে যখন এই সব ঘটনা ঘটছে সে সময়টা ছিল ত্রয়োদশ শতক। এই শতকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়। সুলতানরা বন কেটে ফেলে, শিকারি ও পশুপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ঐ এলাকাতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মজবুত করেছিলেন। তাঁরা কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করেন। তৈরি হয় নতুন নতুন শহর ও দুর্গ।

সুলতানি ও উত্তরাধিকার

সুলতানির প্রধান শাসক হলেন সুলতান। কিন্তু একজন সুলতান মারা গেলে তার পরে কে সিংহাসনে বসবে তা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা দেখা দিত। ইলতুৎমিশের (মৃত্যু ১২৩৬খ্রিঃ) পর থেকে আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনে বসার সময়ের (১২৯৬খ্রিঃ) মধ্যে কেটে গিয়েছিল ষাট বছর। এই ষাট বছরে দশ জন সুলতান দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। উত্তরাধিকারের কোনো সাধারণ নিয়মনীতি এই সময় ছিল না। এর ফলে ঘন ঘন শাসক বদল হয়েছে। শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে থেকেছে। বর্তমান সুলতানের সন্তান বা বংশধর পরবর্তী সুলতান হবেন কি না তার কোনো ঠিক ছিল না। অভিজাতরা বিদ্রোহ করে আগের সুলতানের বংশধরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শাসক হয়ে বসেছে। ত্রয়োদশ শতকের দিল্লি সুলতানিতে এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

৪.৫ দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার : আলাউদ্দিন খলজি

প্রথম দিকের তুর্কি সুলতানদের শাসনকালে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়েছিল। এরপর সুলতানরা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তারে মন দেন। আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির প্রথম সুলতান যিনি দক্ষিণ ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর। **(৪.২ মানচিত্র দেখো)**

টুকরো কথা

সিজদা ও পাইবস

এ দুটি ছিল পারসিক প্রথা। বলবন নিজেকে পারস্যের কিংবদন্তী নায়কের বংশধর ভাবতেন। রাজদরবারে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করতেন। সিজদা-র অর্থ হলো সুলতানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা। আর সুলতানের পদযুগল চুম্বন করাকে বলা হতো পাইবস। এগুলো ছিল সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক।

টুকরো কথা

খলজি বিপ্লব

১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খলজি বলবনের বংশধরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান হন। এই ঘটনাকে 'খলজি বিপ্লব' বলা হয়। এর ফলে দিল্লিতে ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা চলে যায়। তার বদলে খলজি তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।

এবারে ভেবে বলোতো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশাল এলাকা কীভাবে সুলতানরা শাসন করবেন? এই বিষয়ে জানার জন্য পড়ে দেখো 'সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ' অংশটি *(৪.৭.১ থেকে ৪.৭.৩ এককগুলি দেখো)*।

মানচিত্র ৪.২ : আলাউদ্দিন খলজির সামরিক অভিযান

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

উপরের মানচিত্রে কতগুলো স্থানের নাম খুঁজে পেলে? এর মধ্যে কোন কোন স্থানের নাম বর্তমানেও একই আছে তা আজকের ভারতের মানচিত্র দেখে মেলাও। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।

৪.৬ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর খলজি সুলতানরা দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। এরপর তুঘলক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বড়ো ছেলে মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল (১৩২৪-'৫১খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো দেশের তাঞ্জিয়ার শহরের অধিবাসী ইবন বতুতা এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ বিবরণীর নাম *অল-রিহলা*। মহম্মদ বিন তুঘলকের যুগ সম্পর্কে এই গ্রন্থ একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র।

টুকরো কথা

ইবন বতুতার বিবরণে ভারত

ইবন বতুতার লেখা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ

"ভারতে ডাকে চিঠিপত্র পাঠাবার দু-রকম ব্যবস্থা আছে। ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থাকে 'উলাক' বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি চার মাইল অন্তর ডাকের ঘোড়া রাখা হয়। পায়ে হাঁটা যে-ডাকের ব্যবস্থা আছে তাকে বলা হয় 'দাওআ'। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মাইলের এক-তৃতীয়াংশে ঘনবসতির একটি গ্রাম থাকে। গ্রামের বাইরে তিনটি তাঁবু থাকে। এই তাঁবুতে ডাকের লোকেরা কোমর বেঁধে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে দু-হাত লম্বা একটি লাঠি। প্রত্যেক লাঠির মাথায় কয়েকটি তামার ঘণ্টা বাঁধা থাকে। যখন শহর থেকে সংবাদবাহক রওনা হয় তখন তার এক হাতে থাকে চিঠি আর অন্য হাতে থাকে ঘণ্টা-বাঁধা লাঠিটি। এই চিঠি ও লাঠি নিয়ে সে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়োতে থাকে। ..... দেশে নতুন লোকের আগমন-সংবাদ গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা চিঠি লিখে সুলতানকে জানিয়ে দেয়। সে-চিঠিতে নবাগতের নাম, তার দেহের ও পোশাকাদির বর্ণনা, সঙ্গীদের সংখ্যা, চাকর-বাকর, ঘোড়া ইত্যাদির বিবরণ থাকে। পথে চলার সময় অথবা বিশ্রামের সময় তাদের ব্যবহার কী রকম তা-ও জানানো হয় চিঠিতে।"

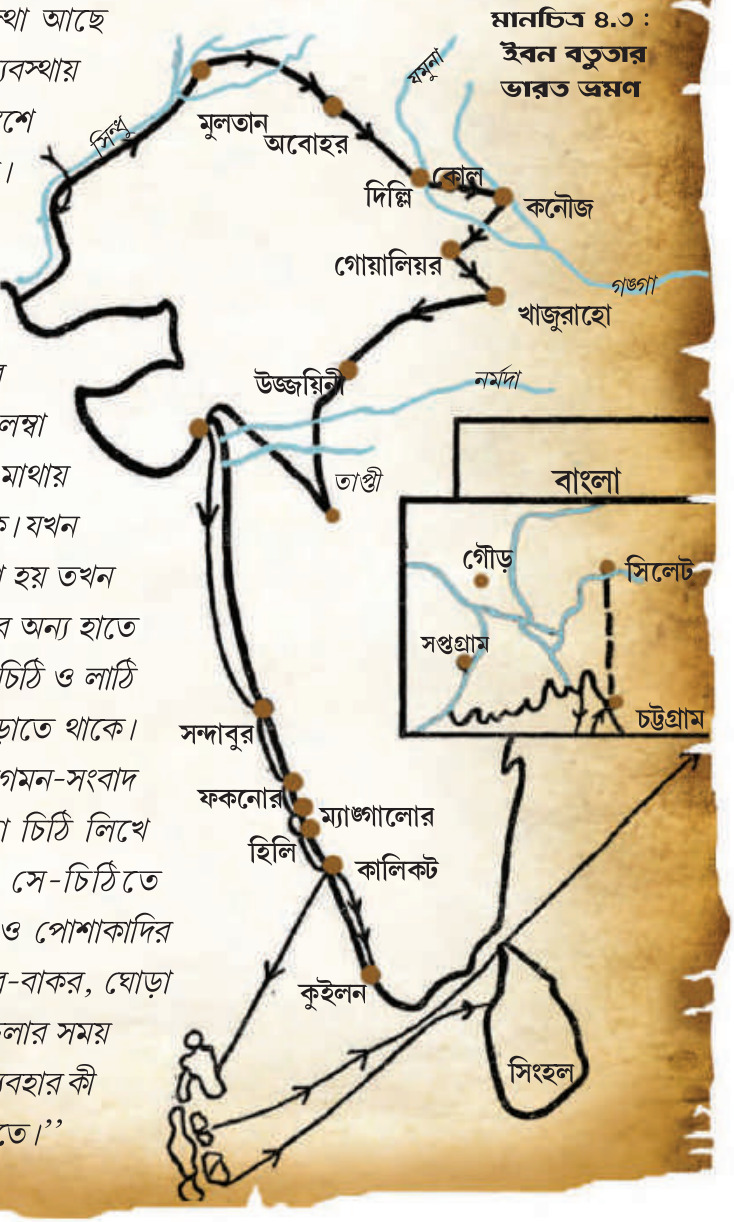

মানচিত্র ৪.৩ : ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ

টুকরো কথা

তুঘলকি কাণ্ডকারখানা

আজকের দিনেও কোনো ব্যক্তির খামখেয়ালি আচরণকে বলা হয় তুঘলকি কাণ্ডকারখানা। কারণ মহম্মদ বিন তুঘলককে কেউ কেউ বলেছেন 'পাগলা রাজা'। আর তাঁর কাজকর্মকে বলা হয়েছে তুঘলকি কাণ্ড।

তুমিও কি তাই বলবে? **নীচের অংশটা পড়ে নিজে ভাবো :**

- বাড়তি কর সংগ্রহ করার জন্য দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুলতান। অনাবৃষ্টির ফলে সেখানে শস্যের ক্ষতি হয়েছিল। প্রজারা বাড়তি কর দিতে পারেনি। তারা বিদ্রোহ করে। সুলতান বাড়তি কর মকুব করেন। নষ্ট হওয়া ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ দেন। কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সুলতান *তকাভি* ঋণ দান প্রকল্প চালু করেছিলেন।
- দিল্লির অধিবাসীদের বিরোধিতা এবং মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা পেতে ও দাক্ষিণাত্যকে শাসন করতে দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী তৈরি করেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ওই শহরের নতুন নাম হয় দৌলতাবাদ। সুলতানের হুকুমে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে যেতে গিয়ে পথে অনেক মানুষ প্রাণ হারান। কয়েক বছর পরে সুলতান আবার রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে যান দিল্লিতে।
- মূল্যবান ধাতু সোনা এবং রুপোর ঘাটতি মেটাতে তামার মুদ্রা চালু করেন সুলতান। ওই মুদ্রা যাতে

মানচিত্র ৪.৪ :

ভারত (আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রিঃ)

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

জাল না করা যায় তার জন্য আগে থেকেই তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। অনেকে তামার মুদ্রা জাল করে। বাজার থেকে জাল মুদ্রা তুলে নিতে রাজকোষ থেকে অনেক সোনা ও রুপোর মুদ্রা ব্যয় করতে বাধ্য হন সুলতান।

- মহম্মদ বিন তুঘলক কয়েকজন অনভিজাত, সাধারণ ব্যক্তিকে প্রশাসনে উঁচু পদে বসিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন মদ তৈরি করতেন, একজন ছিলেন নাপিত, একজন ছিলেন পাচক ও দুজন ছিলেন মালি। তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুলতান এভাবে সাধারণ হিন্দুস্তানিদের ওপর নির্ভরতা দেখিয়েছিলেন।

- মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজকর্মের মধ্যে কোন কোন দিক ঠিক ছিল বলে তুমি মনে করো?
- তুমি কি মনে করো যে সুলতান কিছু ভুল করেছিলেন? কী কী ভুল করেছিলেন বলে তুমি মনে করো?
- তুমি যদি ওই যুগে নতুন রাজধানী তৈরি করতে তা হলে কেমন অঞ্চল বাছতে ও কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে?
- দেশের মুদ্রা জাল হলে কী কী অসুবিধা হতে পারে বলে তুমি মনে করো?
- মহম্মদ বিন তুঘলক প্রায় সাতশো বছর আগে শাসন করতেন। এতবছর পরেও তাঁর কাজকর্মের থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
- তোমার শ্রেণির বন্ধুদের মধ্যে ছোটো ছোটো দল করে নাও। এবারে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজকর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বিতর্ক জমিয়ে তোলো।

ছবি ৪.১ : দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মহারাষ্ট্র।

মহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরসূরি ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-'৮৮খ্রিঃ) শাসনকালে একদিকে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তেমনি বেশ কিছু জনকল্যাণের সংস্কারও করা হয়েছে। ক্রমাগত যুদ্ধ করেও তিনি সুলতানি শাসনের বাইরে চলে যাওয়া এলাকাগুলোর ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর থেকে মনে হয় যে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে তত দক্ষ ছিলেন না।

টুকরো কথা

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযান

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযানের একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল দাস জোগাড় করা। ফিরোজ শাহের ১,৮০,০০০ দাস ছিল। তাদের জন্য একটা আলাদা দপ্তর খোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীতে, কারখানায়, বিভিন্ন দপ্তরে দাসরা নিযুক্ত হতো ও বেতন পেত। এভাবে সুলতান একটি অনুগত বাহিনী বানাতে চেয়েছিলেন।

মানচিত্র ৪.৫ : খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষ

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

সৈয়দ এবং লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪১৪-১৫২৬খ্রিঃ) দিল্লি সুলতানির আকার অনেক ছোটো হয়ে এসেছিল। জৌনপুর, গুজরাট, মালওয়া ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজপুতানার মেওয়াড় ও আলওয়াড় ও দোয়াবের হিন্দু শাসকরা সুলতানি শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এছাড়া ছিল স্বাধীন রাজ্য কাশ্মীর।

তবে সুলতান বহলোল লোদির শাসনকালে (১৪৫১-'৮৯খ্রিঃ) জৌনপুর রাজ্য দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আফগান সুলতানদের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই সময়ে রাজতন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছিল। সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান (১৪১৪-'২১খ্রিঃ) নিজে কখনো সুলতান উপাধি নেননি। তিনি একদিকে তুর্কো-মোঙ্গল শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি পূর্ববর্তী তুঘলক শাসকদের নাম খোদাই করা মুদ্রা তাঁর রাজ্যে চালু রেখেছিলেন। মধ্যযুগের ভারতে এই রকম ঘটনা আগে বা পরে কখনো ঘটেনি।

লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪৫১-১৫২৬খ্রিঃ) সুলতানের ক্ষমতা খানিকটা বেড়েছিল। সুলতান বহলোল লোদি আফগানদের সাবেকি রীতি মেনে অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে আসন ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু লোদি আফগানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পাশের জৌনপুর রাজ্য দখল করা ছিল তারই নমুনা। পরবর্তী শাসক সিকান্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭খ্রিঃ) অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে বহলোল লোদির মতো ক্ষমতা ভাগাভাগির নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আফগান সর্দারদের জানানো হয় যে, তারা একান্তভাবেই সুলতানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সুলতানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরেই তাদের ভালো-মন্দ নির্ভর করত। এইভাবে তিনি আফগান সর্দার ও সাধারণ জনগণ উভয়ের ওপরেই নিজের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা করেন।

ছক ৪.১ : এক নজরে দিল্লির সুলতানি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
মামেলুক (দাস)	১২০৬-১২৯০খ্রিঃ	কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিশ রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবন
খলজি	১২৯০-১৩২০খ্রিঃ	জালালউদ্দিন খলজি আলাউদ্দিন খলজি
তুঘলক	১৩২০-১৪১২খ্রিঃ	মহম্মদ বিন তুঘলক ফিরোজ শাহ তুঘলক
সৈয়দ	১৪১৪-১৪৫১খ্রিঃ	খিজির খান
লোদি	১৪৫১-১৫২৬খ্রিঃ	বহলোল লোদি, সিকান্দর লোদি

মনে রেখো

সৈয়দ ও লোদি শাসকরা ছিলেন আফগান। এর আগের শাসকরা ছিলেন তুর্কি। তাই দিল্লির সুলতানদের শাসনকে একসঙ্গে তুর্কো-আফগান শাসন বলা হয়।

৪.৪ মানচিত্রের সঙ্গে ৪.৫ মানচিত্রের তুলনা করো। এই মানচিত্রে নতুন কোন কোন রাজ্য দেখতে পাচ্ছ তার তালিকা করো।

টুকরো কথা

পানিপতের প্রথম যুদ্ধ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপতে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাবর তুর্কিদের থেকে শেখা এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। একে বলা হয় 'রুমি' কৌশল। মুঘলদের ঘোড়সওয়ার তিরন্দাজ বাহিনী ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল। বাবরের সৈন্য সংখ্যা কিন্তু লোদিদের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু বাবর ছিলেন যুদ্ধে পটু। যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদির মৃত্যু হয় এবং দিল্লি ও আগ্রায় মুঘলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছবি ৪.২ :
পানিপতের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সৈন্যদল।
বাবরনামা-র ছবি।

৪.৭.১ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সামরিক নিয়ন্ত্রণ

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বারবার অভিযানকারীরা ভারতে এসেছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে (১২১৮-'২৭ খ্রিঃ) মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ঝড়ের গতিতে যে

অভিযান চালান তার সামনে ওই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতেও মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হলো। দিল্লির সুলতান তখন ইলতুৎমিশ। এই আশঙ্কা পরে চতুর্দশ শতকেও জারি ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের সামনে দিল্লির সুলতানদের সকলের নীতি একরকম ছিল না। এবারে দেখা যাক কীভাবে সুলতানরা এই শক্তির মোকাবিলা করেছিলেন।

১২২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তর-পশ্চিমে বারবার মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে। ওই আক্রমণের সামনে সিন্ধু নদ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বলে চিহ্নিত হয়। ইলতুৎমিশ সরাসরি মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে দিল্লি সুলতানিকে বাঁচিয়ে দেন।

চেঙ্গিজ মারা যাওয়ার পর মোঙ্গল রাজ্য একাধিক অংশে ভাগ হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ওই সময় পশ্চিম এশিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিল্লির সুলতানরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে নিয়েছিলেন। তাঁরা একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামো ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সময় পেয়ে যান। এর ফলে পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ ঠেকাতে তাঁদের সুবিধা হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন বলবন মন্ত্রী থাকার সময়ে (১২৪৬-'৬৬খ্রিঃ) পাঞ্জাবের লাহোর ও মুলতান শহরদুটো পশ্চিম দিক থেকে মোঙ্গল অভিযানের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। দিল্লি সুলতানির পশ্চিম সীমানা পূর্বদিকে আরো সরে আসে। ঝিলাম (বিতস্তা) নদীর বদলে আরো পূর্বদিকে বিপাশা নদী নতুন সীমানা হয়েছিল। বলবন সুলতান হয়ে (১২৬৬-'৮৭খ্রিঃ) তাবরহিন্দ (ভাতিন্দা), সুনাম ও সামানা দুর্গ সুরক্ষিত করেন। বিপাশা নদী বরাবর সৈন্য ঘাঁটি বসান। তিনি নিজে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকেন। একই সঙ্গে তিনি মোঙ্গলদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন কূটনৈতিক চাল হিসাবে। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের সঙ্গে লড়াইয়ে বলবনের বড়ো ছেলে যুবরাজ মহম্মদ প্রাণ হারান।

আলাউদ্দিন খলজির সময়ে (১২৯৬-১৩১৬খ্রিঃ) দিল্লি দু-বার আক্রান্ত হয় (১২৯৯/১৩০০খ্রিঃ এবং ১৩০২-০৩খ্রিঃ)। সুলতান বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। সৈনিকদের থাকবার জন্য সিরি নামে নতুন শহর তৈরি হয়। সেনাবাহিনীকে রসদ জোগানোর জন্য দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর বেশি হারে কর চাপানো হয়। দুর্গনির্মাণ, সৈন্যসংগ্রহ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ করে সফলভাবে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করেন আলাউদ্দিন।

৪.২ ছবিতে কী কী অস্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে ১৩২৬-২৭/১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর- পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অভিযান হয়। সুলতান মোঙ্গলদের তাড়া করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কালানৌর ও পেশোয়ারে সীমান্তঘাঁটি মজবুত করেন। তিনি মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা করেন, সেজন্য বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুলতান *পুরোনো দিল্লি* শহরকে সেনা-শিবির বানিয়ে তোলেন। শহরের অধিবাসীদের তিনি দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দেন। সৈনিকদের বেতন দেওয়ার জন্য দোয়াব অঞ্চলে অতিরিক্ত কর চাপান। শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিরাট সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে বাধ্য হন মহম্মদ বিন তুঘলক।

৪.৭.২ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

সুলতানি শাসনের প্রধান ব্যক্তি সুলতান নিজে। যুদ্ধ, আইন, বিচার, দেশ চালানোর সব ক্ষমতা সুলতানের হাতে থাকত। তবে একজন ব্যক্তি একা সব দিক সামলাতে পারেন না। তাই সুলতান মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। তবে সবাইকেই সুলতানের কাছে অনুগত থাকতে হতো। সুলতানের আদেশ ছিল শেষ কথা। এইভাবে সুলতানকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে।

কখনও কখনও কে আসলে সুলতান হওয়ার যোগ্য— তা নিয়ে গোলমাল হতো। তাই যিনি যখন সুলতান হতেন, তাঁর চেষ্টা থাকত কেউ যেন তাকে নিয়ে প্রশ্ন না করতে পারে। এর জন্য সুলতানরা নিজেদের সবার থেকে আলাদা করে রাখতেন। আর বিচার করতেন কঠোর হাতে। গরিব বা বড়োলোক, অভিজাত বা সাধারণ মানুষ ভেদাভেদ ছিল না বিচারের সময়ে।

যে সুলতান যত ভালোভাবে সবদিক সামলাতে পারতেন, তাঁর শাসন তত বেশিদিন টিকত। তবে বলবনের সময় থেকে সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। সুলতানের উপরে কেউ কথা বলতে পারত না। তার বিরোধিতা করলে শাস্তি পেতে হতো। ফলে, অভিজাতরা (*আমির*) আর সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন করত না। আলাউদ্দিনের সময়ে অভিজাতদের কড়া হাতে দমন করা হয়। কিন্তু, সুলতানের শাসন আলগা হয়ে পড়লেই, অভিজাতদের হাতে ক্ষমতা বেড়ে যেত।

টুকরো কথা

সুলতানি আদবকায়দা

গিয়াসউদ্দিন বলবন চল্লিশচক্র বা বন্দেগান-ই চিহলগানির সদস্য ছিলেন। পরে নিজে যখন সুলতান হলেন, তখন যাতে কেউ তার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতে না পারে তার জন্য দরবারে কতগুলি নিয়ম চালু করেন তিনি। শোনা যায় বলবন খুব জমকালো পোশাক পরে দরবারে আসতেন। কোনো হাসি- তামাসা বা হালকা কথা বরদাস্ত করতেন না। গম্ভীরভাবে দরবারে শাসন কাজ চালাতেন। সুলতানকে দরবার চালাতে দেখে অতিথিদের ভয় করত। আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন তুঘলক একই নীতি নেন। জাঁকজমক করে সাজানো সভার মধ্যে সবচেয়ে দামি পোশাক পরা গম্ভীর সুলতানকে দেখে যে কেউ আলাদা করে চিনতে পারত।

অভিজাত ছাড়াও উলেমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হতো সুলতানকে। যেমন রাজাকে পরামর্শ দিতেন পুরোহিত, তেমনই সুলতানকে পরামর্শ দিতেন উলেমা। তবে বেশিরভাগ সময়েই উলেমার কথা শুনে চলতেন না সুলতানরা। হিন্দু-মুসলমান সব জনগণই সুলতানের প্রজা। ফলে, বাস্তবে শাসন চালাবার জন্যে যা দরকার সুলতানরা তাই করতেন। এই নিয়ে উলেমার সঙ্গে সুলতানদের গোলমালও হতো। সুলতানরা উলেমাকে শাস্তিও দিতেন মাঝেমধ্যে।

তবে নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখতে ওমরাহ ও উলেমার সমর্থনের দরকার হতো সুলতানদের। তাই নানা উপহার ও সম্মান দিয়ে তাদের পাশে রাখতেন সুলতানরা।

সামরিক ব্যক্তিদের হাতে ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্ব— ইকতা ব্যবস্থা

সুলতানি শাসনব্যবস্থা প্রথম দিকে পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী সুলতানরাও সামরিক শক্তিকে শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ বলে মনে করতেন। তবে তারা ধীরে ধীরে একটি সুসংহত, কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলেন। নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সুলতানের নির্দেশে রাজস্ব আদায় করার অধিকার পেতেন।

দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশ বাড়িয়ে ছিলেন। নতুন অধিকার করা অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন ছিল। সেখানে শান্তি বজায় রাখারও দরকার ছিল। সুলতানরা যে সব রাজ্য জয় করলেন, সেই রাজ্যগুলি এক একটি প্রদেশের মতো ধরে নেওয়া হলো। এই প্রদেশ গুলিকেই বলা হতো *ইকতা*। ইকতার দায়িত্বে থাকতেন একজন সামরিক নেতা। তাঁকে বলা হতো *ইকতাদার* বা *মুক্‌তি* বা *ওয়ালি*। ইকতাগুলিকে ছোটো ও বড়ো এই দু-ভাগে ভাগ করা হতো। ছোটো ইকতার শাসক শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। আর বড়ো ইকতার শাসকদের সামরিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা করা, বাড়তি রাজস্ব সুলতানকে দেওয়া, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব বড়ো ইকতার শাসকদের নিতে হতো। ইকতাদাররা সম্পূর্ণভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

টুকরো কথা

উলেমা

আরবি ভাষায় ইল্‌ম মানে হলো জ্ঞান। আলিম মানে হলো জ্ঞানী। বিশেষভাবে যারা ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত তাদের বলে আলিম। একের বেশি আলিমকে বলা হয় উলেমা। উলেমা শব্দটিই বহুবচন। তাই উলেমারা বা উলেমাদের কথাগুলো ঠিক নয়।

টুকরো কথা

ইকতা ব্যবস্থার কথা

*মধ্য এশিয়ার ইসলামীয় সাম্রাজ্যে সামরিক অভিজাতদের ইকতা দেওয়া হতো। এই ইকতাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় নবম শতকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। রাজকোষে তখন যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব জমা পড়ছিল না। এদিকে যুদ্ধ করেও তেমন ধনসম্পদ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই সামরিক নেতাদের বেতনের বদলে ইকতা দেওয়া হতে থাকে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে সেলজুক তুর্কি সাম্রাজ্যে ইকতা ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এ সময়ে সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অংশ ইকতা হিসাবে ভাগ করা হয়। কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। অর্থাৎ বাবা মারা গেলে তার ছেলে একই দায়িত্ব পায়। অটোমান তুর্কিদের আমলে ইকতা ব্যবস্থার পরিবর্তে একই ধরনের অন্য একটি ব্যবস্থার কথা জানা যায়। তাকে বলা হয় **তিমার**। আবার ইরানে ইল-খানদের শাসনের সময়ে (১২৫৬-১৩৫৩খ্রিঃ) ইকতা প্রথার কথা জানা যায়। মিশরেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মুক্তিদের কথা জানা যায়। দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্য বিস্তার, রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রাখার জন্য ইকতা ব্যবস্থার নানা রদবদল ঘটিয়েছিলেন। ইকতাদার বা মুক্তি হতে পারতেন একটা গোটা প্রদেশের শাসনকর্তা। অথবা, তিনি হতেন শুধুই একজন রাজস্ব সংগ্রহকারী, যিনি নিজের ভরণপোষণের জন্য একখণ্ড জমি থেকে রাজস্ব আদায় করতেন।*

সুলতানির বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকেরা অনেক সময় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতেন। জালালউদ্দিন খলজি অথবা বহলোল লোদির মতো অনেকেই প্রথমে আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করে সুলতান হন।

৪.৭.৩ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও জনকল্যাণকর সংস্কার

রাজকোষের আয় বাড়াতে আলাউদ্দিন খলজি কতগুলি অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। আগের সুলতানদের দেওয়া ইকতা বাজেয়াপ্ত করেন। ধর্মীয় কারণে দেওয়া সম্পত্তি ও নিষ্কর জমিগুলি ফিরিয়ে নেন। সমস্ত জমি জরিপ করানো হয়। রাজস্বের হারও বাড়ানো হয়। তার পাশাপাশি সুলতান সুলতানির খরচ কমাতেও চেষ্টা করেছিলেন। আলাউদ্দিন দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা-যমুনা

নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) অধিবাসীদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করেন। এখানে জমি উর্বর হওয়ায় চাষ হতো খুব ভালো। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও গৃহকর, গোচারণভূমি কর, জিজিয়া কর ইত্যাদি কর রাজাদের কাছ থেকে আদায় করার নির্দেশ দেন।

টুকরো কথা

জিজিয়া কর ও তুরুষ্কদণ্ড

অ-মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে মুসলমান শাসকরা জিজিয়া কর আদায় করতেন। এটি ছিল একটি মাথাপিছু কর। এর বিনিময়ে অ-মুসলমানদের জীবন, ধর্ম পালনের অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষা দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরবের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু প্রদেশে প্রথম জিজিয়া কর চালু করেছিলেন।

দিল্লি সুলতানিতে ব্রাহ্মণ, নারী, নাবালক ও দাসদের জিজিয়া দিতে হতো না। সন্ন্যাসী, অন্ধ, খঞ্জ ও উন্মাদ ব্যক্তিরা যদি গরিব হতেন তবে তাদেরকেও জিজিয়া দিতে হতো না। আলাউদ্দিন খলজি খরাজের সঙ্গেই জিজিয়া নিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবশালী অ-মুসলমান ব্যক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কমানো। কারণ, সুলতান ভাবতেন তারাই সাম্রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্ম দিত। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-'২৪খ্রিঃ) এমনভাবে জিজিয়া চাপান যাতে অ-মুসলমান প্রজারা একেবারে দরিদ্র না হয়ে পড়ে, আবার তারা মাথা চাড়া দিয়েও উঠতে না পারে। ফিরোজ শাহ তুঘলক খানিকটা ব্যতিক্রমীভাবে ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

জিজিয়া করের মতো এক ধরনের কর কোনো কোনো হিন্দু রাজারাও চালু করেছিলেন। এই কর তারা চাপাতেন তাদের মুসলমান প্রজাদের উপর। ওই করকে বলা হতো তুরুষ্কদণ্ড (তুর্কিদের/মুসলমানদের উপর চাপানো কর)।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। এর মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন, এবং ঐ সৈন্যদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। আলাউদ্দিন বাজারের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেন। আলাউদ্দিন খলজির আমলে দিল্লিতে চারটি বড়ো বাজার ছিল। এইসব বাজারে খাদ্যদ্রব্য, ঘোড়া, কাপড়

টুকরো কথা

খরাজ, খামস, জিজিয়া ও জাকাত

ফিরোজ তুঘলকের আমলে চার ধরনের কর আদায় করা হয়। এগুলি হলো--- খরাজ— কৃষিজমির উপর আরোপ করা কর। খামস— যুদ্ধের সময়ে লুট করা ধন সম্পদের একটি অংশ। জিজিয়া— অ-মুসলমানদের উপর আরোপ করা কর। জাকাত— মুসলমানদের সম্পত্তির উপর আরোপ করা কর।

ইত্যাদি বিক্রি হতো। বাজারদর তদারকির জন্য 'শাহানা-ই মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই রিয়াসৎ' নামে রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সুলতানের ঠিক করে দেওয়া দামের থেকে বেশি দাম নিলে বা ক্রেতাকে ওজনে ঠকালে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দিন রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রয়োজনের সময়ে প্রজাদের সুলতানের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য ও রোজের প্রয়োজনীয় জিনিস পরিমাণ মতো জোগান দেওয়া হতো।

মহম্মদ বিন তুঘলকের আর্থিক পরীক্ষার কথা তোমরা আগেই জেনেছো। তাঁর পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের রীতিনীতি এবং উলেমার নির্দেশে শাসন পরিচালনা করতেন। তবে বেশ কিছু জনকল্যাণকর কাজও তিনি করেছিলেন। ফিরোজ রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ইসলামীয় রীতি অনুযায়ী যে সমস্ত কর আদায় করা যেতে পারে, শুধু সেই করগুলি নেওয়া হতো। অন্যান্য কর বাতিল করা হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একাধিক নতুন নগর, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল এবং বাগান তৈরি করেন। দরিদ্রদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি দপ্তর খোলেন। সেখান থেকে চাকরি দেওয়া হতো। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। বেশ কিছু খাল খনন করা হয়। তাছাড়া যে সব জমিতে চাষ হতো না, সেই জমির সংস্কার করেন সুলতান।

ছবি ৪.৩ :
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির একটি সোনার মুদ্রার দুটি পিঠ।

৪.৮ প্রাদেশিক শাসন

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ দিক থেকেই দিল্লির সুলতানি শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলায় ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন, এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের শাসন।

৪.৮.১ বাংলায় ইলিয়াসশাহি ও হোসেনশাহি শাসন

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন। তিনি বাংলার তিনটি প্রধান রাজ্য লখনৌতি, সাতগাঁ এবং সোনারগাঁ যুক্ত করে বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু করলেন। ইলিয়াস শাহ পূর্ব বঙ্গ এবং কামরূপকে তাঁর শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। দিল্লিতে তখন ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসন করছেন। তিনি ইলিয়াসের রাজধানী পাণ্ডুয়া দখল করে নেন।

টুকরো কথা

দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ

ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন, ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এই দুর্গটির কোনো চিহ্নই আজ আর নেই। দুর্গটি ঘিরে ছিল গঙ্গার দুই শাখা নদী— চিরামতি এবং বালিয়া। গৌড় থেকেও এই দুর্গটি খুব দূরে ছিল না। দুর্গটি প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল।

ফিরোজ শাহ সৈন্য সমেত ফিরে যাওয়ার ভান করেন। সে সময়ে ইলিয়াস শাহের সৈন্য একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ফিরোজ শাহকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে যায়। ফিরোজ শাহ তৈরি ছিলেন। যুদ্ধে দিল্লির সুলতান জয়ী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ দখল করতে পারেননি। বাংলায় শাসক হিসেবে তাই ইলিয়াস শাহই থেকে গেলেন।

ছবি ৪.৪ :
শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর একটি মুদ্রার দুটি পিঠ।

মনে রেখো

- সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-'৫৮খ্রিঃ) বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি দিল্লির সুলতানি শাসনের আওতার বাইরে এই স্বাধীন শাসন তৈরি করেছিলেন।
- সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন ফারসি কাব্যের একজন সমঝদার। তাঁর আমলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য জোরদার হয়েছিল।
- সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু) (১৪১৫-'১৬, ১৪১৮-'৩৩খ্রিঃ) জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বাংলার রাজধানী মালদহের হজরত পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে চলে আসে।
- অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তী ইলিয়াসশাহি সুলতানরা ছিলেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর বংশধর।
- ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসনের মাঝে বাংলায় আবিসিনীয় সুলতানরা শাসন করেছিলেন। এরা আফ্রিকার আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া থেকে এসেছিলেন। বাংলায় এদের হাবশি বলা হয়।
- আফগান নেতা শের খানের আক্রমণে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন শেষ হয়।

ছক ৪.২ : এক নজরে ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
ইলিয়াসশাহি	১৩৪২-১৪১৪/১৫খ্রিঃ	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
রাজা গণেশের বংশ	আনু. ১৪১৪/১৫-১৪৩৫খ্রিঃ	রাজা গণেশ, জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু)
পরবর্তী ইলিয়াসশাহি	আনু. ১৪৩৫-১৪৮৬খ্রিঃ	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দিন বরবক শাহ
হোসেনশাহি	১৪৯৩-১৫৩৮খ্রিঃ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ

টুকরো কথা

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত-এ লিখেছেন যে, সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে একটি নির্দেশ দেন। তাতে বলা হয়, চৈতন্যদেব সবাইকে নিয়ে কীর্তন করুন অথবা চাইলে তিনি একাকী থাকুন। তাঁকে যদি কেউ বিরক্ত করে, তা সে কাজি হোক বা কোতোয়াল, তার প্রাণদণ্ড হবে।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর ছাব্বিশ বছরের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রিঃ) শাসনকাল বিখ্যাত তাঁর উদারনীতির জন্য। তাঁর রাজত্বে হিন্দুদের দেওয়া হতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। আলাউদ্দিনের উজীর, প্রধান চিকিৎসক, তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ও টাঁকশালের অধ্যক্ষ সবাই ছিলেন হিন্দু। সুলতান হোসেন শাহ স্বভাবে ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী এবং সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। শোনা যায় যে, হোসেন শাহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। নাম করা দুই বৈষ্ণব ভাই রূপ ও সনাতনের মধ্যে একজন হোসেনের দপ্তরে ব্যক্তিগত সচিব (দবির-ই খাস) পদ পান। সাধারণ মানুষ নাকি হোসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করত। বাংলা ভাষা চর্চায় ভীষণ উৎসাহী ছিলেন হোসেন শাহ তাঁর শাসনকালে বাংলা ভাষায় লেখালেখির চর্চা উন্নত হয়।

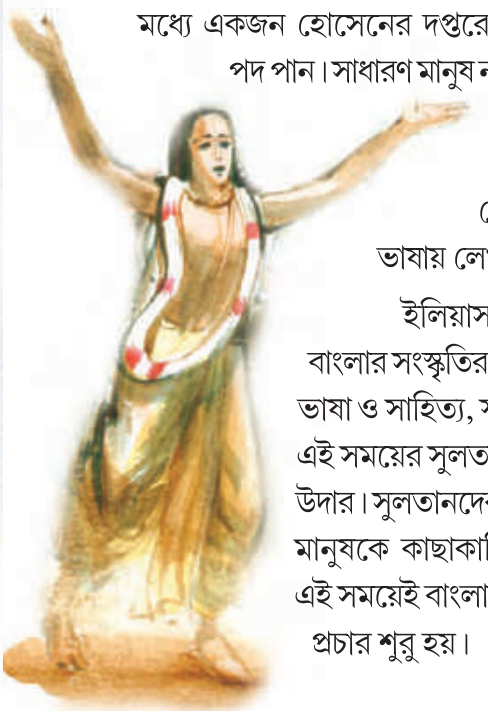

ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির উন্নয়ন হয়েছিল। এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়। এই সময়ের সুলতানরা ছিলেন অন্য ধর্মমত বিষয়েও উদার। সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা বাংলায় সব ধর্মের মানুষকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিলেন। এই সময়েই বাংলায় শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তিবাদের প্রচার শুরু হয়।

৪.৮.২ দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান

গল্প আছে যে সঙ্গম নামের এক ব্যক্তির ছেলেরা ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে দুজন হলেন প্রথম হরিহর ও বুক্ক। বিজয়নগরে ১৩৩৬ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট চারটি রাজবংশ শাসন করেছিল। এই বংশগুলি হলো সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরাবিডু।

প্রথম হরিহর ও বুক্ক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গম রাজবংশ প্রায় দেড়শো বছর টিকেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায়। সঙ্গম বংশের দুর্বল শাসক বিরূপাক্ষকে সরিয়ে নরসিংহ সালুভ বিজয়নগরে সালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অযোগ্য শাসকের জন্য সালুভ রাজবংশের পতন ঘটে। সালুভ রাজবংশের সেনাপতির ছেলে বীরসিংহ সালুভ বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তুলুভ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের বিখ্যাত শাসক। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরের গৌরব সবচেয়ে বেড়েছিল। সে সময়ে সাম্রাজ্যের সীমা বেড়েছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। এছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি তাঁর সময়ে লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তেলুগু ভাষায় লেখা *আমুক্তমাল্যদ* গ্রন্থে তিনি রাজার কর্তব্যের কথা লিখেছেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হাসান গঙ্গু ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ নাম নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন আহ্সনাবাদ। শাসনের সুবিধার জন্য বাহমন শাহ তাঁর রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করেন। এই ভাগগুলি হলো গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার এবং বিদর। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের মৃত্যুর (১৩৫৮খ্রিঃ) পর তাঁর ছেলে মহম্মদ শাহ গুলবর্গার শাসক হন। বাহমনি বংশের সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রিঃ) একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। শিল্পের প্রতিও তাঁর উৎসাহ ছিল।

ছবি ৪.৩ : গুলবর্গা দুর্গের একটি অংশ, উত্তর কর্ণাটক।

টুকরো কথা

রাজা কৃষ্ণদেব রায়

পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। পেজ বলেছেন—

" রাজাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত এবং সর্বোত্তম একজন মহান শাসক এবং সুবিচারক, সাহসী ও সর্বগুণান্বিত"।

এরপর বাহমনি রাজ্যের রাজধানী চলে আসে বিদর শহরে। বাহমনি রাজ্যের শাসক তৃতীয় মহম্মদের শাসনকালে (১৪৬৩-'৮২খ্রিঃ) তাঁর মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান বাহমনি রাজ্যের গৌরব বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং পরিচালক। তাঁর নির্দেশে তৈরি বিদর শহরের মাদ্রাসাটি খুবই বিখ্যাত।

মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (১৪৮১ খ্রিঃ) পর বাহমনি রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়ে। পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উদ্ভব হয়। সেগুলি হলো আহমেদনগর, বিজাপুর, বেরার, গোলকোন্ডা এবং বিদর।

ছবি ৪.৬ :
মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা, বিদর (পঞ্চদশ শতক)

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তুলুভ রাজত্বকালেই বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনি রাজ্যের উত্তরসূরি পাঁচটি সুলতানির মিলিত শক্তির যুদ্ধ হয়। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বানিহাটি বা তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয়।

বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্য দুটি প্রথম থেকেই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটানা লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধানত রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই লড়াই হয়েছিল।

এই যুদ্ধের পরে তুলুভ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আরাবিভু বংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। এই বংশের প্রথম শাসক ছিলেন তিরুমল এবং শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্কট।

ভেবে বলো

বিজয়নগর এবং দক্ষিণের সুলতানিগুলির মধ্যে তিনটি অঞ্চলকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই অঞ্চল গুলি হলো— তুঙ্গভদ্রা নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল, কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং মারাঠওয়াড়া দেশ। এইসব জায়গার জমি উর্বর এবং বাণিজ্যের প্রভাব বেশি ছিল। মনে রেখো এই জায়গাগুলিকে ঘিরে দ্বন্দ্ব শুধু বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের মধ্যে হয়নি। তার আগেও চালুক্য ও চোল রাজাদের মধ্যে এবং যাদব ও হোয়সল রাজাদের মধ্যে এই অঞ্চলকে নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল।

কৃষ্ণা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ—দুই পারের শাসকরাই উপাধি নিতেন 'সুলতান'। দিল্লির সুলতানদের অনেক আদবকায়দা তারা মেনে চলতেন। বিজয়নগরের শাসকরা নিজেদের বলতেন হিন্দু রাইদের (রাজা) মধ্যে সুলতান। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় নিজের বাহিনীর জন্য তুর্কি যুদ্ধপদ্ধতি আমদানি করেন। তার আমলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

তাহলে ভেবে দেখোতো, বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির সংঘর্ষকে কি হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘর্ষ বলা চলে?

মানচিত্র ৪.৬ : বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

মনে রেখো

- কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে বলা হয় রাইচুর দোয়াব।
- বাহমনি রাজ্যে দেশীয় অভিজাতদের বলা হতো দক্ষিণী। এই অঞ্চলের বাইরে থেকে যে অভিজাতরা এসে দরবারে স্থান পেতেন তাঁদের বলা হতো পরদেশী। অর্থাৎ 'দেশ' বলতে মানুষ কেবল নিজের এলাকাটাই বুঝতো।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে বিজয়নগর

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বিদেশি পর্যটক আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারস্যের দূত আব্দুর রাজ্জাক, পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ ও নুনিজ, দুয়ার্তে বারবোসা প্রমুখ। এঁরা সকলেই বিজয়নগরের সম্পদ দেখে বিস্মিত হন। বিজয়নগর শহরটি সাতটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। ভূমি রাজস্বই ছিল রাজ্যের প্রধান আয়। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পোর্তুগিজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তবে পর্যটকরা একথাও বলেছেন যে ধনী ও গরিবদের জীবনযাপনে অনেক তফাৎ ছিল।

কোনো দেশ বিষয়ে বিদেশি পর্যটকের বিবরণ কি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়? এর পক্ষে-বিপক্ষে তোমার কী কী যুক্তি?

টুকরো কথা

পর্যটক পেজের বর্ণনায় বিজয়নগর

".....নগরটি রোম শহরের মতোই বড়ো, দেখতে বড়োই সুন্দর। নগরের ও বাড়িগুলির বাগানের মধ্যে অনেক গাছের কুঞ্জ আছে। স্বচ্ছ জলের অনেকগুলি খাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাঝে মাঝে আছে দীঘি, রাজপ্রাসাদের কাছেই আছে তালবন ও অন্যান্য ফলের গাছ। এই নগরের লোকসংখ্যা অসংখ্য। রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে এত লোক ও হাতি চলাচল করে যে তার মধ্যে দিয়ে অশ্বারোহী বা পদাতিক কোনো সৈন্য যেতে পারে না।

এ শহরটির মতো এত খাওয়া- পরার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে নেই। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাস্তায় ও বাজারে ভারবাহী এত ষাঁড় চলাচল করে যে তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় না, হয়তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিংবা অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হয়।"

ছবি ৪.৭ : বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী হাম্পির একটি রথমন্দিরের আঁকা ছবি।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও :

(ক) ইলতুৎমিশ, রাজিয়া, ইবন বতুতা, বলবন।

(খ) তাবরহিন্দ, সুনাম, সামানা, ঝিলাম।

(গ) খরাজ, খামস, জিজিয়া, আমির, জাকাত।

(ঘ) আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, পাঞ্জাব, বিদর।

(ঙ) বারবোসা, মাহমুদ গাওয়ান, পেজ, নুনিজ।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
খলিফা	বাংলা
বলবন	দুরবাশ
খলজি বিপ্লব	বাবর
রুমি কৌশল	তুর্কান-ই চিহলগানি
রাজা গণেশ	ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতার অবসান

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) দিল্লির সুলতানদের কখন খলিফাদের অনুমোদন দরকার হতো?

(খ) সুলতান ইলতুৎমিশের সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা কী ছিল?

(গ) কারা ছিল সুলতান রাজিয়ার সমর্থক? কারা ছিল তাঁর বিরোধী?

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজি কীভাবে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করেন?

(ঙ) ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) ৪.২ মানচিত্র থেকে আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিবরণ দাও।

(খ) দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের অভিজাতদের কেমন সম্বন্ধ ছিল তা লেখো।

(গ) ইকতা কী? কেন সুলতানরা ইকতা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন?

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজির সময় দিল্লির বাজার দর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

(ঙ) বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে তুমি কী একটি ধর্মীয় লড়াই বলবে? তোমার যুক্তি দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে দিল্লির একটি বাজারে যেতে তাহলে কেমন অভিজ্ঞতা হতো তা লেখো।

(খ) মনে করো তুমি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারে একজন রাজকর্মচারী। সে যুগের ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে যদি তুমি একটি বই লিখতে তা হলে তাতে কী লিখতে?

(গ) মনে করো তুমি রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে পোর্তুগাল থেকে বিজয়নগর রাজ্যে বেড়াতে এসেছো। এ দেশের অবস্থা দেখে তুমি নিজের দেশের এক বন্ধুকে চিঠিতে কী লিখবে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য

৫.১ মুঘল কারা?

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুঘলরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। অবশ্য খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকেই তাদের ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির বাস। সেখানে এতবছর ধরে শাসন পরিচালনা করা খুবই কঠিন কাজ। মুঘলরা দক্ষতার সঙ্গেই সেই কাজ চালিয়েছিল।

একদিকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এবং অন্য দিকে তুর্কি নেতা তৈমুর লঙ-এর বংশধরদের আমরা মুঘল বলে জানি। মুঘলরা তৈমুরের বংশধর হিসেবে গর্ববোধ করত। নিজেদের তারা তৈমুরীয় বলে ভাবত। বরং, চেঙ্গিস খানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কম ছিল। ভারতবর্ষের প্রথম মুঘল বাদশাহ ছিলেন জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর (১৫২৬-'৩০খ্রিঃ)।

সফাবি—সফাবিরা ছিল ইরানের একটি রাজবংশ। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তারা শাসন করে।

উজবেক—উজবেকরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি তুর্কিভাষী জাতি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে তারা মধ্য এশিয়ায় একাধিক রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

টুকরো কথা

তৈমুর লঙ ও বাবর

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। তাই মুঘলরা মনে করত উত্তর ভারতে তাদের শাসনের অধিকার আছে। ভারতবর্ষে আসার আগে মুঘলরা মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চলে শাসন করত। এর আগে চতুর্দশ শতকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে তৈমুর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেন। এই অঞ্চলগুলি হলো পূর্ব ইরান বা খোরাসান, ইরান, ইরাক, এবং তুরস্কের কিছু জায়গা। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে তৈমুরীয় শাসকদের ক্ষমতায় ভাঁটা পড়ে। এর প্রধান কারণ ছিল তাঁদের বংশধরদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত করার রীতি। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরীয় বংশের বাবর মাত্র বারো বছর বয়সে ফরগনা প্রদেশের শাসনভার পান। পরবর্তীকালে মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে উজবেক এবং সফাবিদের মতো সাফল্য না পেয়ে বাবর অবশেষে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন।

ছবি ৫.১ :
খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে আঁকা এই ছবির মধ্যের ব্যক্তিটি তৈমুর লঙ। সঙ্গে তাঁর বংশধররা। এর মধ্যে রয়েছেন প্রথম ছয়জন মুঘল সম্রাট।

বাদশাহ কে?

মুঘলরা সার্বভৌম শাসকের ক্ষেত্রে *পাদশাহ* অথবা *বাদশাহ* শব্দটি ব্যবহার করত। তোমরা দেখেছো আগে দিল্লির শাসকেরা নিজেদের *সুলতান* বলতেন। মুঘলরা কিন্তু সুলতান শব্দটি যুবরাজদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। যেমন ধরো, জাহাঙ্গিরের নাম ছিল সলিম। তিনি যখন যুবরাজ হলেন, তখন তাঁকে বলা হতো সুলতান সলিম। বাদশাহ উপাধি ব্যবহার করে মুঘলরা বোঝাতে চাইলো যে, তাদের শাসন করার ক্ষমতা অন্য কারোর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল নয়।

কথার মানে

বাদশাহ— বাদশাহ বা পাদশাহ বা পাদিশাহ শব্দগুলি ফারসি। *পাদ* অর্থাৎ প্রভু এবং *শাহ* অর্থাৎ শাসক বা রাজা, এই দুটি শব্দ এখানে যোগ হয়েছে। মনে হতে পারে প্রায় একই অর্থবিশিষ্ট দুটি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করার কারণ কী? খুব শক্তিশালী শাসক বোঝাতে একসঙ্গে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুলে থাকার সময় পাদশাহ উপাধি নেন।

সার্বভৌম শাসক— সার্বভৌম শাসক বলতে বোঝায় সর্ব ভূমির উপর যার আধিপত্য। সর্ব ভূমি বা গোটা পৃথিবীর উপর তো কোনো একজন মানুষের আধিপত্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ বুঝতে হবে যাঁর আধিপত্য একটি বিরাট অঞ্চলের উপর থাকে এবং যিনি সেখানে নিজের ক্ষমতায় শাসন করেন, তিনি সার্বভৌম শাসক। এই কথাটি শুধু সেই শাসক নিজে জানলেই হবে না, সবাই সেটা মেনে নিলেই তাঁর অধিকার টিকে থাকবে।

৫.১ ছবিতে যে এগারো জনের ছবি রয়েছে, তারা একসঙ্গে একই সময়ে জীবিত ছিলেন না। তাহলে এমন ছবি আঁকার কারণ কী হতে পারে?

৫.২ মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার : যুদ্ধ ও মৈত্রী

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শুধু যুদ্ধের উপরই নির্ভর করে ছিল না। একদিকে ভারতবর্ষের ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত হয়েছিল। আবার তাদের সঙ্গে মৈত্রীও হয়েছিল। আমরা আগেই জেনেছি যে, পানিপতের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬খ্রিঃ) বাবর আফগান শক্তিকে পরাজিত করেন। আফগানরা ছাড়াও এই সময় ভারতের আর এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছিল রাজপুতরা। রাজপুত শক্তিও বাবরের কাছে পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে রাজপুতরা মুঘলদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল।

টুকরো কথা

মুঘল রণকৌশল

পানিপত ও খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের রণকৌশল একদিকে কামান ও বন্দুকধারী সৈন্য এবং অন্যদিকে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার তিরন্দাজ বাহিনী এই দুইয়ের যৌথ আক্রমণের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা অংশ শত্রুপক্ষকে দুই পাশ আর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করত এবং কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যরা সামনে থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করত। একসাথে এই দুই রকম আক্রমণে শত্রুপক্ষ যখন দিশাহারা, তখন বাকি ঘোড়সওয়াররা সামনে থেকে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। এই রণকৌশল ব্যবহার করে তুরস্কের অটোমান তুর্কি সেনাবাহিনী ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে চল্‌দিরানের যুদ্ধে পারস্যদেশের রাজশক্তি সফাবিদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। আবার অটোমানদের কাছে শিখে একই কৌশল অবলম্বন করে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে জামের যুদ্ধে সফাবিরা উজবেকদের হারিয়ে দেয়।

একনজরে বাবরের আমলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রিঃ)— মেওয়াড়ের রানা সংগ্রাম সিংহ (রানা সঙ্গ) রাজপুতদের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাবর মুঘল যোদ্ধাদের বলেন এই যুদ্ধ তাদের ধর্মের লড়াই। তারা হলেন ধর্মযোদ্ধা বা গাজি। আসলে এভাবে তিনি সকলকে জোটবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। আবার, উত্তর ভারত থেকে বাবরকে হটানোর জন্য কয়েকজন মুসলমান শাসকও রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন। কাজেই এই যুদ্ধ ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না।

ঘর্ঘরার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রিঃ)— আফগানদের বিরুদ্ধে বাবর এই যুদ্ধ করেন। আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার শাসক নসরৎ শাহ। এই যুদ্ধে জিতলেও বাবর বিহারে পাকাপাকি অধিকার কায়েম করতে পারেননি।

মুঘল উত্তরাধিকার নীতি

বাবরের সঙ্গে তাঁর সামরিক অভিজাতদের পারিবারিক এবং বংশগত যোগ ছিল। শাসকশ্রেণির সঙ্গে অভিজাতদের এই যোগ মুঘল শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আমলে (১৫৩০-'৪০, ১৫৫৫-'৫৬খ্রিঃ) কিন্তু এই যোগ অনেকটাই আলগা হয়ে পড়ে। তাঁর দুঃসময়ে ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করেনি।

তৈমুরীয় নীতি মোতাবেক উত্তরসূরিদের মধ্যে যে অঞ্চল ভাগ করার প্রথা ছিল, হুমায়ুন কিন্তু তা মানেননি। বাবরও শাসক হিসাবে হুমায়ুনকেই মনোনীত করে গিয়েছিলেন। হুমায়ুন সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতেই রেখেছিলেন। ভাইদের কেবল কিছু অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সরাসরি শাসনের দায়িত্ব না পাওয়ায় তাঁরাও সাম্রাজ্য রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেননি। তাই শেষমেশ একজোট হয়েও আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী জয়ী হতে পারেনি।

কথার মানে

সামরিক অভিজাত

সামরিক অভিজাত তাদের বলা যায় যাঁরা বংশগতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এছাড়া তারা খুব গুরুত্বপুর্ণ পদও পেতেন। অনেক সময় এঁদের রাজপরিবারের সঙ্গে পারিবারিক যোগ থাকতো।

টুকরো কথা

বাবরের প্রার্থনা : সত্যি হলেও গল্প

হুমায়ুন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন সদ্য আফগানিস্তানের বদখশান থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছেন। বাবরের কাছে হুমায়ুনের অসুস্থতার খবর পৌঁছল। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হুমায়ুন যখন দিল্লি পৌঁছলেন, তখন তিনি এতটাই অসুস্থ যে ঘোরের মধ্যে ছিলেন। শোনা যায় এই সময় বাবরকে একজন পরামর্শ দেন যে, হুমায়ুনের খুব প্রিয় কোনো জিনিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করলে হয়ত তাঁকে বাঁচানো যাবে। তখন বাবর নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এর পরের গল্পটা কিন্তু ইতিহাস বলে ধরে নেওয়া যায় না। বলা হয় বাবরের প্রার্থনায় হুমায়ুন প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। এর পরেই বাবর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মারা যান। গল্পকথা হলেও এর থেকে এটুকু বোঝা যায় যে হুমায়ুন ছিলেন বাবরের প্রিয়পুত্র। তাই তিনি হুমায়ুনকেই শাসক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

টুকরো কথা

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব

মুঘলদের বিরোধীরা সবসময় একজোট ছিল না। মুঘলদের দুই প্রধান বিরোধী শক্তি রাজপুত এবং আফগানদের মধ্যে বিরোধ ছিল। এদের মধ্যে বিহারে আফগানদের নেতৃত্ব দেন হুমায়ুনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শের খান। হুমায়ুন পর পর দু-বার শের খানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের চৌসার যুদ্ধে আর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে। তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে হুমায়ুনকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। এই সময়ে পারস্যের শাহ তাহমস্প হুমায়ুনকে আশ্রয় দেন। হুমায়ুনের এই পালিয়ে বেড়ানোর সময়েই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ)। ইতোমধ্যে দিল্লি-আগ্রায় শের খান 'শাহ' উপাধি নিয়ে সম্রাট হন। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ ক্ষমতায় আসেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, সেই সুযোগে হুমায়ুন দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন হুমায়ুন শাসন করতে পারেননি। দিল্লির পুরানো কেল্লার পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান।

শের শাহের (১৫৪০-'৪৫ খ্রিঃ) সংস্কার

শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শের শাহ কিছু সংস্কার করেছিলেন।

- শের শাহ কৃষককে 'পাট্টা' দিতেন। এই পাট্টা-য় কৃষকের নাম, জমিতে কৃষকের অধিকার, কত রাজস্ব দিতে হবে প্রভৃতি লেখা থাকত। তার বদলে কৃষক রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে কবুলিয়ত নামে অন্য একটি দলিল রাষ্ট্রকে দিত।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে শের শাহ সড়কপথের উন্নতি করেন। তিনি বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সড়ক সংস্কার করান। রাস্তাটির নাম ছিল 'সড়ক-ই আজম'। এই রাস্তাই পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত হয়। এছাড়াও আগ্রা থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরি হয়। লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত আরও একটি রাস্তা তৈরি হয়।
- পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল।
- শের শাহ ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন।
- সেনা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থা চালু রাখেন শের শাহ।

ছবি ৫.২ : শেরশাহের সমাধি সৌধ, সাসারাম, বিহার

ছবি ৫.৩ :
বাদশাহ আকবরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ।

আকবর যখন শাসনভার পেলেন (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ), তখন তাঁর বয়স তেরো। অর্থাৎ তখন তিনি তোমাদেরই বয়সি। ভেবে দেখো এই বয়সে সাম্রাজ্য চালানো কী কঠিন কাজ! আকবরকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান। আঠারো বছর বয়সে আকবর সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেন। কিন্তু সে তো পরের কথা। যখন তিনি প্রথম সিংহাসনে বসলেন, তখন দিল্লিতে শের শাহের এক আত্মীয় আফগান শাসন ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর নাম আদিল শাহ। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিমু দিল্লি শহর দখল করে নেন। তোমরা দেখেছো দিল্লি এবং আগ্রা ছিল সে যুগে শাসনক্ষমতার কেন্দ্র। দিল্লি দখল করা মানেই সাম্রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া। বৈরাম খানের সাহায্যে আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপতের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের হারিয়ে দেন। আকবর একে একে মধ্য ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে কয়েকটি ছোটো রাজ্য, চিতোর, গুজরাট , বাংলা ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। এরপর, মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের সংঘাত হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিরোধকে কিন্তু বহিরাগতদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘাত বলা চলে না। যারা মুঘলদের বিরোধিতা করেছিল, তারা জোটবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের জন্য লড়াই করেনি।

টুকরো কথা

মুঘলদের মেওয়াড় অভিযান

রাজপুত রাজাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল চিতোর দুর্গ। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবর চিতোর জয় করেন। তার আগেই চিতোরের রানা উদয় সিংহ চিতোর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর অন্যান্য রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হলেও, উদয় সিংহের ছেলে রানা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের কাছে অধীনতা স্বীকার করলেন না। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটির যুদ্ধে আকবর রানা প্রতাপকে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধের সময় আকবর আজমিরে পৌঁছে রাজা মান সিংহকে ৫০০০ সৈন্য সমেত রানা প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠান। রাজা মান সিংহও কিন্তু রাজপুত ছিলেন। অর্থাৎ মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত শক্তি মিলিত হয়ে লড়াই করেনি। রানা প্রতাপ চিতোর পর্যন্ত গোটা এলাকার ফসল নষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে মুঘল সৈন্য খাবার না পায়। তিনি তাঁর রাজধানী কুম্ভলগড় থেকে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান। রানার পক্ষে কয়েকজন আফগান সর্দারও ছিল। রানা যুদ্ধে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার পরেও রানা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

ছবি ৫.৪ :
বাদশাহ আকবরের চিতোর দুর্গ অভিযান। ছবি দুটি *আকবরনামা* গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

টুকরো কথা

আকবরের নবরত্ন সভা ও রাজা বীরবল

আকবরের দরবারে বহু বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে ন-জনকে একত্রে বলা হতো নবরত্ন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা বীরবল। বীরবলের বুদ্ধির অনেক গল্পই হয়তো তোমরা পড়েছ। তার অনেকটা গল্পকথা হলেও বীরবল কিন্তু সত্যিই খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। বীরবলের জন্ম হয় মধ্য প্রদেশের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর নাম ছিল মহেশ দাস। তাঁর বুদ্ধির জোরেই তিনি আকবরের সভায় স্থান পেয়েছিলেন। আকবর তাঁর নাম দেন বীরবল। এখানে বীর এবং বল শব্দগুলি বুদ্ধির জোর বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তাঁকে 'রাজা' উপাধিও দেওয়া হয়। আকবরের সময় তিনি ওয়াজির-ই আজম বা প্রধানমন্ত্রী হন।

টুকরো কথা

আবুল ফজল ও আবদুল কাদির বদাউনি

আকবরের আমলের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন আবুল ফজল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২ খ্রিঃ)। তাঁর লেখা আকবরনামায় তিনি আকবরের প্রশংসাই করেছেন। কিন্তু যে কোনো সময়ের ইতিহাস জানতে হলে শুধু ভালো কথা জানলেই হয় না। সে যুগের সমস্যার কথাও জানতে হয়। এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া যায় সে যুগের আর একজন ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনির (১৫৪০-১৬১৫ খ্রিঃ) মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ বইতে। এঁরা দুজনেই মুঘল দরবারে এসেছিলেন ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু আবুল ফজল হয়ে উঠেছিলেন আকবরের প্রিয় পাত্র। একই ঘটনার দু-ধরনের বিবরণ পাওয়া যায় এঁদের দুজনের লেখায়।

ছবি ৫.৫ :
আবুল ফজল বাদশাহ আকবরকে আকবরনামা উৎসর্গ করছেন।

তোমরা আর কোথাও রাজা বীরবলের গল্প পড়েছো? পড়ে থাকলে সেই গল্পটা নিজের ভাষায় লেখো।

এখন আমরা ভারতের যে মানচিত্র দেখি, তখন সেরকম ছিল না। 'দেশ' বলতে তারা কেবল কিছু অঞ্চল কে বুঝত। এই সংঘাত আসলে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছিল। এরা সকলেই ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করেছিলেন।

আকবর শুধু যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমেই শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন স্থানীয় শাসকদের মুঘল দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে। স্থানীয় মানুষের কাছে কেবল আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে চাননি আকবর। মুঘলরা উত্তর ভারত জয় করে দাক্ষিণাত্যেও পৌঁছে গিয়েছিল। এদিকে আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, সিন্ধু প্রদেশ এবং পূর্ব বেলুচিস্তানও মুঘলদের শাসনের আওতায় চলে আসে। ভারতবর্ষের উপর বিদেশি আক্রমণ এই পথেই বেশি হতো। তাই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করতে এই অঞ্চলে মুঘল প্রভাব তৈরি করা দরকার ছিল। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও উন্নত ছিল না । মুঘল সৈন্যকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

আকবরের মৃত্যুর সময় (১৬০৫ খ্রিঃ) ভারতবর্ষের এক বিরাট এলাকা মুঘলদের দখলে চলে এসেছিল। তবে তার বাইরে দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মুঘলদের অধিকার বলবৎ হয়নি। বাংলায় মুঘলরা সামরিক সাফল্য পেলেও, তার ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। সেখানে আফগানদের পুরোপুরি হারিয়ে মুঘল শাসন ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আরও বেশ কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল।

মানচিত্র ৫.১ :
খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মুঘল সাম্রাজ্য

ছবি ৫.৬ :
জাহাঙ্গিরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ।

আকবরের ছেলে ও উত্তরসূরি জাহাঙ্গিরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহীরা এক সঙ্গে 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গির বাংলার জমিদারদের নিজের দলে টানার চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গিরের সময়েই বাংলা ভালো ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর আমলে মেওয়াড়ের রানাও মুঘলদের আধিপত্য মেনে নেন। তবে মুঘলরা কিন্তু সব রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেনি। যেমন ধরো, শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক ভালো থাকেনি (এই সম্বন্ধে আমরা আরও জানব অষ্টম অধ্যায়ে)।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মুঘল রাষ্ট্রকাঠামোয় জাহাঙ্গির মোটামুটিভাবে আকবরের নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। ফলে নতুন নতুন মনসবদাররা মুঘল

শাসনব্যবস্থায় শামিল হতে থাকে। এ ছাড়া আগে থেকে রাজপুতরা তো ছিলই। আবার, মুঘল দরবারের অভিজাতদের মধ্যেও রেষারেষি চলত। দরবারি অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্বে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, শাহজাদা খুররম (পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান), নূরজাহানের পরিবারের সদস্যরা ও অন্যান্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শাহজাহানের শাসনের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ) শুরুতেই দাক্ষিণাত্যে খান জাহান লোদী বিদ্রোহ করেন। মুঘলদের কাছে তিনি পরাজিত হন। বুন্দেলখন্দের বিদ্রোহ দমন করা এবং আহমেদনগরে অভিযান পাঠানো হয়। শাহজাহান উজবেকদের থেকে বলখ জয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। শাহজাহানের আমলেই মুঘলরা কান্দাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়।

টুকরো কথা

বলখ এবং বদখশান

মধ্য এশিয়ায় বলখ এবং বদখশান ছিল বুখরার উজবেক শাসক নজর মহম্মদের অধীনে। তাঁর পুত্র আবদুল আজিজ বিদ্রোহ করেন এবং পিতাকে পরাজিত করেন। নজর মহম্মদ বাদশাহ শাহ জাহানের সাহায্য চান। পরে পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হলেও মুঘলরা বলখ আক্রমণ করে। মনে রেখো, মধ্য এশিয়ায় মুঘলদের প্রাচীন বাসভূমি সমরকন্দ। তারা বারবার এই অঞ্চলে ক্ষমতা কায়েম করার চেষ্টা করেছিল।

ছবি ৫.৭ :
মুঘলদের দৌলতাবাদ অভিযান। ছবিটি আবদুল হামিদ লাহোরির *পাদশাহনামা* থেকে নেওয়া।

শাহজাহানের জীবনের শেষদিকে তাঁর ছেলেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বেধে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দারাশিকোহ্ ও অন্য ভাইদের হটিয়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৮-১৭০৭খ্রিঃ) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা অনেক চেষ্টায় মুঘলদের দখলে আসে। ফলে মারাঠা ও দক্ষিণী মুসলিম অভিজাতরা মুঘল শাসনে যোগ দেয়। এর ফলে মনসবদারি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য বেড়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে মনসব পাওয়া নিয়েও অভিজাতদের মধ্যে রেষারেষি তৈরি হয়েছিল। কৃষিব্যবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মথুরায় জাঠ কৃষকরা এবং হরিয়ানায় সৎনামি কৃষকরা বিদ্রোহ করে। শিখ এবং মারাঠাদের মতো আঞ্চলিক শক্তি মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছিল। রাজপুতদের সঙ্গে সংঘাত এবং দাক্ষিণাত্যে একটানা চলতে থাকা যুদ্ধে সাম্রাজ্যের আয়তন যেমন বেড়েছিল, সমস্যাও বেড়েছিল। মুঘলদের সঙ্গে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর যে যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়। মুঘল সাম্রাজ্যকে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

ছবি ৫.৮ :
ঔরঙ্গজেব ও দারাশিকোহ্-র মধ্যে সামুগড়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়ী হন।

বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের নাম ও শাসনকালের একটি তালিকা তৈরি করো।

শাসনের শুরুতেই ঔরঙ্গজেব উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। অসমের অহোম শাসককে প্রথমে দমন করা গেলেও, তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুঘলরা চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে বাংলাকে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কখনো যুদ্ধ কখনো মৈত্রীর নীতির মাধ্যমে আফগান অধ্যুষিত অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন ঔরঙ্গজেব। কিন্তু এখানে মুঘল সৈন্যের একটি বড়ো অংশ বহুদিন ব্যস্ত ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা যায়নি।

৫.৩ মুঘলদের রাজপুত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র : আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব

৫.৩.১ মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে সম্পর্ক

মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের ক্ষমতা দখল করতে গেলে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা দরকার। কারণ, রাজপুতরাই ছিল উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চলের জমিদার। পরে এই ধারণা থেকেই বাদশাহ আকবর মৈত্রী ও যুদ্ধনীতির সাহায্যে রাজপুতদের মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এলেন। মুঘল বাদশাহ ও শাহজাদাদের সঙ্গে কোনো কোনো রাজপুত পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হলো। এক্ষেত্রে আকবর কিন্তু নতুন কিছু করেননি। এর আগেও মুসলমান শাসকদের সঙ্গে হিন্দু রাজপরিবারের মেয়েদের বিয়ে হতো। আকবর নিজের স্ত্রীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার বজায় রেখেছিলেন। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে তীর্থ কর ও জিজিয়া কর তুলে নেন। যুদ্ধবন্দিদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাও তিনি নিষিদ্ধ করেন। এতে সাম্রাজ্যের অ-মুসলমান প্রজারা খুশি হয়েছিল। তবে মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেননি। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই পড়েছি।

আকবরের নীতির ফলে মুঘলরা বীর রাজপুত যোদ্ধাদের পাশে পেয়েছিল। রাজপুতরাও ওয়াতনের বাইরে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুনামের সঙ্গে কাজ করার ও বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পায়। মুঘল বাদশাহের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে রাজপুতরা ওয়াতনের ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারত। তবে কোনো রাজপুত রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল হলে মুঘলরা সেই রাজ্য সাময়িকভাবে পুরোপুরি হাতে নিয়ে নিত। তারপর মুঘল বাদশাহের ইচ্ছা অনুযায়ী গদিতে নতুন শাসক বসতেন।

টুকরো কথা

ওয়াতন

ওয়াতন কথাটির মানে হলো নিজের ভিটে বা এলাকা, স্বদেশ। যেমন, রাজা ভারমল, ভগবন্তদাস ও মানসিংহের বংশের ওয়াতন ছিল আধুনিক জয়পুর শহরের কাছে অম্বর বা আমের এলাকা।

ছবি ৫.৯ :
মুঘল দরবারে বাদশাহ আকবর রাজপুত অভিজাতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। ছবিটি *আকবরনামা* থেকে নেওয়া।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গির ও শাহ জাহান আকবরের রাজপুত নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। জাহাঙ্গিরের আমলে মেওয়াড়ে মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রানা প্রতাপের ছেলে অমর সিংহ উঁচু মনসব পেয়েছিলেন। শাহজাহানের আমলে রাজপুত সর্দাররা দূর মধ্য এশিয়াতেও লড়াই করতে গিয়েছিল। এই আমলেও রাজপুতদের উঁচু পদ দেওয়া হতো।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রাজপুতরা মুঘল মনসবদারি ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল। অম্বরের মির্জা রাজা জয়সিংহ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত অভিজাতদের মধ্যে একজন। মারওয়াড়ের রাঠোর রাজপুত রানা যশোবন্ত সিংহ প্রথমে বাদশাহের বিরোধী ছিলেন। তবে পরে তিনি মোটা রকমের মনসব পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার নিয়ে মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুরে গন্ডগোল শুরু হয়। মুঘলরা ওই রাজ্যটি পুরোপুরি হাতে নিয়ে নেয়। এর ফলে শুরু হয় রাঠোর যুদ্ধ (১৬৭৯ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধে গোড়ার দিকে মেওয়াড় রাজ্য মারওয়াড়ের পক্ষে ছিল। রাঠোর যুদ্ধ মুঘলদের পক্ষে লাভজনক হয়নি। উপরন্তু, আকবর জিজিয়া কর তুলে নেওয়ার একশো বছর পরে ঔরঙ্গজেব আবার জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন (১৬৭৯ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘলদের রাজপুত নীতিতে অনেক মিল ছিল। আবার, কোনো কোনো দিকে অমিলও ছিল।

টুকরো কথা

মারওয়াড়

*রাজস্থানের ভাষায় '**ওয়াড়**' শব্দের মানে একটি বিশেষ অঞ্চল। মারওয়াড় শব্দটি এসেছে '**মরুওয়াড়**' (মরু অঞ্চল) কথাটি থেকে।*

৫.৩.২ মুঘল রাজশক্তি ও দাক্ষিণাত্য

বাহমনি রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি সুলতানি রাজ্যের উত্থানের কথা আমরা আগেই পড়েছি। এ সব হলো মুঘলদের ভারতে আসার আগের ঘটনা। আকবরের শাসনকালের প্রথম দিকে যখন উত্তর ভারতে মুঘলরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে, দাক্ষিণাত্যে তখন সুলতানি রাজ্যগুলি একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করছে। মনে রেখো, বিজয়নগরের পরাজয়ের পরে সুলতানি রাজ্যগুলির সামনে রাজ্যবিস্তার করার অনেক সুযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ওই সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে বড়ো বড়ো জমির মালিক মারাঠা সর্দার ও সৈনিকরা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলিতে পুরোনো অভিজাত ও বাইরে থেকে আসা নতুন অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। এর মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগিজরাও পা রেখেছিল।

এই অবস্থায় মুঘলরা দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বাড়াতে চাইল। দাক্ষিণাত্য ছিল দিল্লি-আগ্রা থেকে বহু দূরে। আকবরের ভেবেছিলেন যে দক্ষিণী রাজ্যগুলি অনেক রাজপুত রাজ্যের মতোই মুঘলদের বন্ধু হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ছিল বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমেদনগর, বেরার, বিদর ও খান্দেশ। ১৫৯৬ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুঘলরা বেরার, আহমেদনগর ও খান্দেশ জয় করে। খান্দেশের গুরুত্বপূর্ণ অসিরগড় দুর্গটিও মুঘলদের হাতে চলে আসে। আহমেদনগরের

প্রধানমন্ত্রী মালিক অম্বরের চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে।

জাহাঙ্গির মারাঠা শক্তির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁদের দলে টানবার চেষ্টা করেন। আকবরের সময়ে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের যা অবস্থা ছিল জাহাঙ্গির তাই বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আহমেদনগর রাজ্যটি মুঘলদের দখলে আসে। ঐ বছরেই শাহজাহান বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সঙ্গে চুক্তি করে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। পরে মুঘলরাই এই চুক্তি ভেঙে দেয়। এর ফলে দাক্ষিণাত্যের শাসকরা মুঘলদের ওপর আস্থা হারান।

ছবি ৫.১০ :
মুঘল সৈন্য গোলকোন্ডার একটি দুর্গ আক্রমণ করছে (খ্রিস্টীয় ১৭শ শতক)। ছবিটি *পাদশাহনামা* থেকে নেওয়া

৫.৪, ৫.৭, ৫.৮ ও ৫.১০-এই চারটি ছবিতে কোন কোন অস্ত্র ও পশুকে যুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখতে পাচ্ছো? এই ছবিগুলি থেকে মুঘলদের যুদ্ধ করার বিষয়ে কী কী জানা যাচ্ছে?

টুকরো কথা

দাক্ষিণাত্য ক্ষত্র

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ঔরঙ্গজেবের সময়ে মারাঠাদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন যে দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে জয় করতে পারলে সেখানে থেকে অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করা যাবে। তার সঙ্গে মারাঠাদের দমন করাও সহজ হবে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘলরা বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দখল করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন এত বড়ো আগে কখনো হয়নি। কিন্তু বাদশাহ যা ভেবেছিলেন তা হলো না। তার বদলে বহু বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুঘলদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হলো। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের এই ক্ষত আর সারলো না। মারাঠা নেতা শিবাজীকেও স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিতে হলো। পঁচিশ বছর ধরে যুদ্ধ করে ঔরঙ্গজেব শেষে দাক্ষিণাত্যেই মারা গেলেন (১৭০৭ খ্রিঃ)।

মানচিত্র ৫.২ :
মুঘল সাম্রাজ্য (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিঃ)

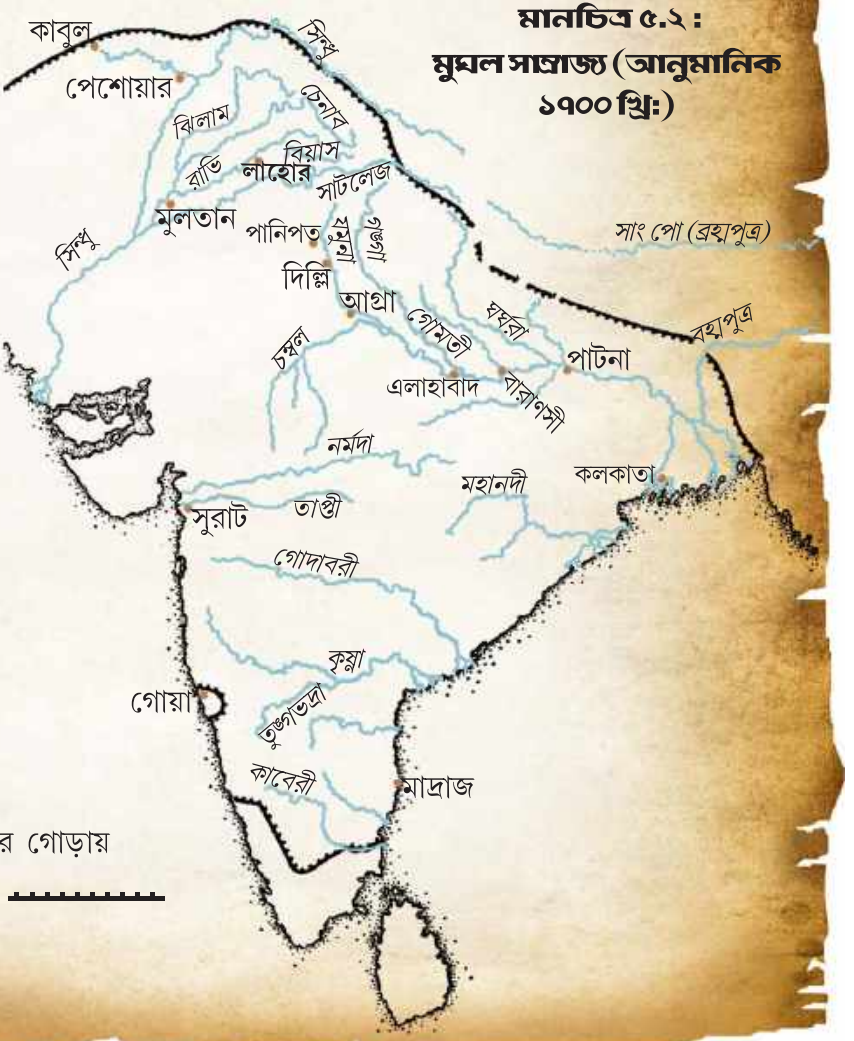

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা .....

৫.৪ বাদশাহি শাসন : প্রশাসনিক আদর্শ

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক আদর্শ ছিল মূলত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটি যথার্থই ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। আকবরের প্রশাসনিক আদর্শ তৈমুরীয়, পারসিক এবং ভারতীয় রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা চলে। এই আদর্শে বাদশাহ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করবেন এবং প্রজাদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ ভালোবাসা থাকবে। অর্থাৎ তাঁর শাসন করার অধিকার অন্য কোন শাসকের থেকে পাওয়া নয়। এই ক্ষমতা তাঁর নিজের। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত থাকবে না। সকলের প্রতি সহনশীলতা এবং সকলের জন্য শান্তির এই পথকেই বলা হয় '*সুলহ-ই কুল*'। এই আদর্শের ভিত্তিতে আকবর একটি ব্যক্তিগত মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন যাকে বলা হয় '*দীন-ই ইলাহি*'।

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনকাল যুদ্ধ বিগ্রহেই কেটেছিল। প্রশাসনের দিকে তিনি সেভাবে নজর দিতে পারেননি। মুঘল শাসনের মাঝে আফগান শাসক শেরশাহের প্রশাসনিক পরিকাঠামো সুপরিকল্পিত ছিল যা পরবর্তীকালে আকবর অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রদেশগুলিকে বলা হতো *সুবা*। সুবাগুলি আবার ভাগ করা হতো কয়েকটি *সরকারে* এবং সরকারগুলি ভাগ করা হতো *পরগনাতে*।

আকবর সামরিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন। সেটি ছিল তাঁর মনসবদারি ব্যবস্থা। আকবরের শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদগুলিকে বলা হতো মনসব। আর পদাধিকারীদের বলা হতো মনসবদার। মনসবদারদের কর্তব্য ছিল বাদশাহের জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখা, সৈন্যদের দেখাশোনা করা এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য জোগান দেওয়া। পদ অনুসারে মনসবদারদের বিভিন্ন স্তর ছিল। সবচেয়ে উপরের পদগুলি কেবল রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য রাখা থাকত। উচ্চপদস্থ মনসবদারদের বলা হতো *আমির*। মনসবদারদের যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে পর্যবেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজধানীতে হাজির করতে হতো।

৫.১ ও ৫.২ মানচিত্র দুটির তুলনা করে বলো অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কোন কোন অঞ্চল মুঘল শাসনের আওতায় এসেছিল ?

টুকরো কথা

মনসবদার ও জায়গির

- মনসবদারদের দু-ভাবে বেতন দেওয়া হতো — নগদে অথবা রাজস্ব বরাত দিয়ে। রাজস্বের এই বরাতকে বলা হতো জায়গির। জায়গির যিনি পেতেন তিনি জায়গিরদার। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো জায়গিরদারি ব্যবস্থা। যে রাজস্ব আদায় করা হতো, তার এক অংশ দিয়ে জায়গিরদাররা নিজেদের ভরণপোষণ করত এবং ঘোড়সওয়ারদের দেখাশোনা করত। জায়গির মানে কিন্তু জমি নয়। চাষজমি, বন্দর এলাকা, বাজার এ সবের থেকেই রাজস্ব আদায়ের বরাত জায়গির হিসাবে দেওয়া হতো।
- মনসবদারদের বাদশাহ নিজেই নিয়োগ করতেন। তাদের পদোন্নতিও তাঁর উপরই নির্ভর করত।
- জায়গিরদারদের বদলি করা হতো।
- মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না।

রাজস্ব ব্যবস্থা এবং জাবতি

ভারতবর্ষ ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। তাই ভালভাবে শাসন পরিচালনা করতে হলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য জমি জরিপ করার বা মাপার ব্যবস্থা ছিল। পরে শেরশাহের সময়ও জমি মাপা হয়। আকবর নতুন করে জমি জরিপ করান। জমি জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় 'জাবতি'। 'জাবত' মানে নির্ধারণ। শেরশাহ বিভিন্ন শস্যের মূল্য অনুযায়ী একটি তালিকা তৈরি করিয়েছিলেন। আকবর দেখলেন যে এই তালিকার প্রধান সমস্যা হলো রাজধানীতে শস্যের মূল্যের সঙ্গে অন্যান্য জায়গার শস্যের মূল্য সব সময় মিলছে না। রাজধানীর শস্যমূল্য অন্যান্য জায়গার থেকে বেশি ছিল। রাজধানীর হিসাবে চললে কৃষকদের আরও বেশি রাজস্ব দিতে হতো। তাই আকবর প্রত্যেক বছরের এবং প্রতিটি এলাকার আলাদা হিসাব চালু করলেন। প্রত্যেক এলাকার উৎপাদন, বাজারে শস্যের মূল্য ইত্যাদি নানারকম তথ্য সরকারকে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল কানুনগোদের। রাজস্ব আদায় করত এবং কানুনগোদের তথ্য মিলিয়ে দিত যে সব কর্মচারী তাদের বলা হতো করোরী। আগের দশ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে চালু এই ব্যবস্থাকে

বলা হয় 'দহসালা' ব্যবস্থা। 'দহ' মানে দশ। আকবর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে দহসালা ব্যবস্থা চালু করেন। আকবরকে এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল এবং আরো কয়েকজন রাজকর্মচারী। টোডরমলের নাম থেকেই এই ব্যবস্থার নাম হয় টোডরমলের বন্দোবস্ত। অবশ্য মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র জাবতি ব্যবস্থা চালু ছিল না।

রাজস্ব যাঁরা আদায় করতেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া থাকতো কৃষকদের অত্যাচার না করতে। সরকার দুঃসময়ে কৃষকদের ঋণ দিত। কখনো দরকারমতো রাজস্ব মকুবও করা হতো। আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্বার্থ যেমন দেখা হয়েছিল, কৃষকদের সুবিধার কথাও মাথায় রাখা হয়েছিল। তবে বিদ্রোহী কৃষককে রাষ্ট্র কঠোর সাজা দিত।

ছবি ৫.১১ :
অশ্বারোহী শাহজাহান (মূল রঙিন ছবিটি শিল্পী প্রয়াগের আঁকা)।

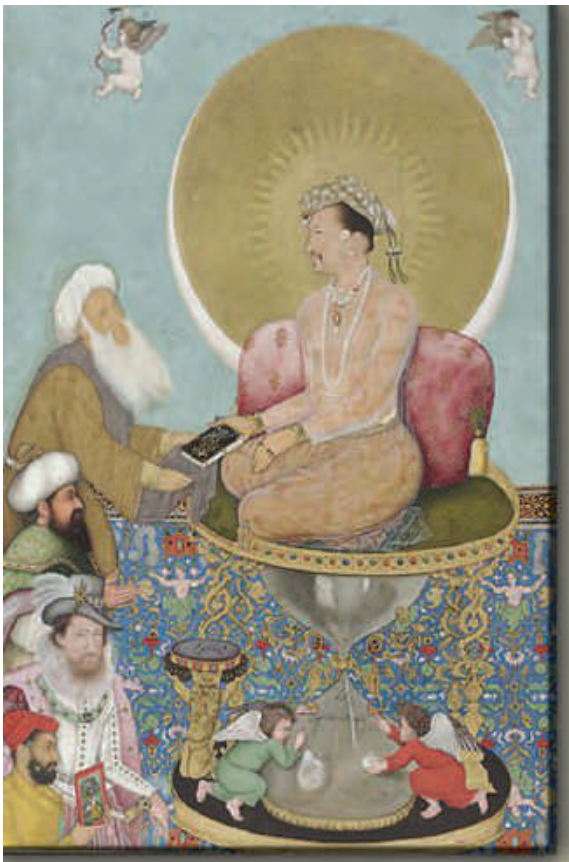

মুঘল কারখানায় শুধু বাদশাহের প্রতিকৃতিই আঁকা হতো না, পশু-পাখি এবং উদ্ভিদও আঁকা হতো। এই ছবিগুলি অনেক সময়ই কয়েকজন শিল্পী মিলে তৈরি করতেন। রঙের ব্যবহার আর সূক্ষ্ম কারুকার্যের দক্ষতা দেখা যায় ছবিগুলিতে। [(১) জাহাঙ্গির ও সুফি (শিল্পী : বিচিত্র), (২) চিনার গাছে কাঠবেড়ালি (শিল্পী : আবুল হাসান), (৩) নীলগাই এবং (৪) বহুরূপী (শিল্পী : মনসুর)]

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ঘর্ঘরার যুদ্ধে বাবরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন _____ (রানা সঙ্গ/ ইব্রাহিম লোদি/নসরৎ খান)।

(খ) বিলগ্রামের যুদ্ধ হয়েছিল _____ (১৫৩৯/ ১৫৪০/ ১৫৪১) খ্রিস্টাব্দে।

(গ) জাহাঙ্গিরের আমলে শিখ গুরু _____ (জয়সিংহ/ অর্জুন/ হিমু) কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজপুত নেতাদের মধ্যে মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে জোট বাঁধেননি রানা _____ (প্রতাপসিংহ / মানসিংহ/ যশোবন্ত সিংহ)।

(ঙ) আহমেদনগরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন _____ (টোডরমল/ মালিক অম্বর/ বৈরাম খান)।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) বিবৃতি : মুঘলরা তৈমুরের বংশধর হিসাবে গর্ব করত।

ব্যাখ্যা-১ : তৈমুর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তৈমুর এক সময় উত্তর ভারত আক্রমণ করে দিল্লি দখল করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তৈমুর ছিলেন একজন সফাবি শাসক।

(খ) বিবৃতি : হুমায়ুনকে এক সময় ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি নিজের ভাইদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি শের খানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি রানা সঙ্গের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

(গ) বিবৃতি : মহেশ দাসের নাম হয়েছিল বীরবল।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁর গায়ে খুব জোর ছিল।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

(ঘ) বিবৃতি : ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি পোর্তুগিজ জলদস্যুদের হারিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি শিবাজিকে পরাজিত করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি বাংলায় বাণিজ্যের উপর কর ছাড় দিয়েছিলেন।

(ঙ) বিবৃতি : আকবরের আমলে জমি জরিপের পদ্ধতিকে বলা হতো জাবতি।

ব্যাখ্যা-১ : জাবত মানে বাজারে শস্যের দাম ঠিক করা।

ব্যাখ্যা-২ : জাবত মানে একমাত্র বাদশাহ কর আদায় করতে পারেন।

ব্যাখ্যা-৩ : জাবত মানে জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা।

৩। **সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :**

(ক) মুঘলরা কেন নিজেদের বাদশাহ বলতো?

(খ) হুমায়ুন আফগানদের কাছে কেন হেরে গিয়েছিলেন?

(গ) ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে কোনো মুঘল অভিজাতদের মধ্যে রেষারেষি বেড়েছিল?

(ঘ) সুলহ-ই কুল কী?

(ঙ) মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সুবা প্রশাসনের পরিচয় দাও।

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :**

(ক) পানিপতের প্রথম যুদ্ধ, খানুয়ার যুদ্ধ ও ঘর্ঘরার যুদ্ধের মধ্যে তুলনা করো। পানিপতের প্রথম যুদ্ধে যদি মুঘলরা জয়ী না হতো তাহলে উত্তর ভারতে কারা শাসন করতো?

(খ) শেরশাহর শাসন ব্যবস্থায় কী কী মানবিক চিন্তার পরিচয় তুমি পাও তা লেখো।

(গ) মুঘল শাসকদের রাজপুত নীতিতে কী কী মিল ও অমিল ছিল তা বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) দাক্ষিণাত্য অভিযানের ক্ষত মুঘল শাসনের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

(ঙ) মুঘল সম্রাটদের কি কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিল? উত্তরাধিকারের বিষয়টি কেমনভাবে তাঁদের শাসনকে প্রভাবিত করেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি বাদশাহ আকবরের মতো বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের দেশে সম্রাট হতে তাহলে তোমার ধর্ম নীতি কী হতো?

(খ) মনে করো তুমি সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তাহলে কেমন ভাবে তুমি দাক্ষিণাত্যের সমস্যার মোকাবিলা করতে?

(গ) মনে করো তুমি খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের একজন মারাঠা মনসবদার। তোমার জায়গির থেকে আয় কমে গেছে। এই অবস্থায় মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। তুমি কী করবে? কেন করবে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।